ছন্দপতন

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

ছন্দপতন

আমি একজন কবি।

গোড়াতে একথাটাও জানিয়ে রাখি যে আমার বয়স মোটে পঁচিশ বছর।

নীরব কবি, হবু কবি বা অখ্যাত অজ্ঞাত কবি আমি নই। দু'খানা কবিতা সংকলনের রীতিমত নামকরা কবি। বই দু'খানা চারিদিকে প্রচুর সাড়া তুলেছে। আমার কবিতা নিয়ে বিশেষ করে তরুণ মহলে গুঞ্জনের অন্ত নেই।

আরেকটু বলা দরকার। কারণ, অল্পবয়সী কবি সম্পর্কে একটা চলতি ধারণা সৃষ্টি হয়ে আছে— অনেক বদ্ধমূল সংস্কারের মতই সেটা জোরালো। তরুণ কবি বলতে লোকে ধরে নেয় কমবেশী স্নায়ুপ্রবণ, ভাবপ্রবণ পরম বেহিসেবী অকেজো অভিমানী একটা জীব— জীবন ও জগৎটা যার কাছে নিছক স্বপ্নাদ্য ব্যাপার।

আমার সম্বন্ধে এরকম একটা ধারণা নিয়ে এ কাহিনী পড়তে বসলে আমার অনেক কথা আর কাজের ঠিক ঠিক মানেটি বুঝতে অসুবিধা হবে— অসুবিধা কেন, মানে বোঝা সম্ভব হবে না। কারণ, আমি ঠিক বিপরীত রকম কবি এবং মানুষ।

আমি বস্তুবাদী কবি।

শুধু কবিতায় নয় সব বিষয়েই বস্তুবাদী।

বস্তুবাদী কবি কি ?

যে সত্যবাদী কবি। ছুটো একই কথা। বস্তুই সত্য, সত্যই বস্তু।

আমি কবিতা লিখি, শব্দমদ চোলাই করি না। আকাশ চষে আমি কাব্যফুলের চাষ করি না, মাটির পৃথিবীতে মানুষেরই জীবন নিয়ে কাব্যের ফসল ফলাই। জীবন্ত মানুষের বিচিত্র কাব্যময় প্রাণবস্ত জগৎ থেকে ভিন্ন মানব জগতের অস্তিত্ব নেই আমার কাছে। ভাব চিন্তা আবেগ অনুভূতি সবই পার্থিব জীবনের রসে পুষ্ট।

ছেলেবেলা থেকেই কবিতায় খোকামি আর ন্যাকামি আমার পিত্তি জ্বালিয়ে দিয়েছে। মনে পড়ে পনের বছর বয়সে লিখেছিলাম—

> শব্দ মদ বেচা শুঁড়িগুলো
> কাব্যলক্ষ্মীর দেহ চিরদিন কচি রেখে দিল।
> শুঁড়িগুলো সব মরে যাক,
> কাব্যলক্ষ্মীর দেহে যৌবনের জোয়ার ঘনাক।

ইচ্ছারূপিণী কাব্যলক্ষ্মীর সব বয়সের বিচিত্র রূপের সঙ্গে তখনও অবশ্য আমার পরিচয় ঘটে নি, কিন্তু এ থেকে বোঝা যাবে সতেজ প্রাণবন্ত কবিতার দিকে ওই বয়সেই আমার কেমন পক্ষপাতিত্ব ছিল।

শুধু কবিতায় নয়, জীবনেও আমি বস্তুবাদী।

কবি তার কবিতায় একরকম, জীবনে অন্যরকম—এটা আমার উদ্ভট ব্যপার মনে হয়। এ যেন ব্রহ্মচারীর নারী অঙ্গ স্পর্শ না করেও শুধু ইচ্ছা শক্তির সাহায্যে পুত্রোৎপাদন।

কবি ছাড়া কবিতা হয় না। কবিতায় আত্মপ্রকাশ না করে কবির উপায় নেই। যে কোন কবির কবিতা পড়ে বলে দেওয়া সম্ভব কবি আসলে কিরকম মানুষ।

কবিতায় যা লিখেছি তার বাইরে আমি কেমন মানুষ বোধ হয় খানিকটা বোঝা যাবে এই কবিতা ছাপিয়ে কবি হিসাবে নাম করার কথাটা বললে।

বাইশ বছর বয়সে আমি প্রথম স্থির করি এবার আমার কবিতা বাজারে ছাড়া দরকার!

তার আগে কোথাও একটি কবিতাও আমি প্রকাশ করি নি।

এই বয়সের কবির কবিতা ছাপাবার প্রথম প্রচেষ্টায় কত কুণ্ঠা কত ভীরুতা থাকে কারো অজানা নেই,—কবিতা লিখে সে যেন মস্ত অপরাধ করেছে, কবিতা ছাপাতে চেয়ে অপরাধ করতে চলেছে তার চেয়েও মারাত্মক!

ভীরু লাজুক কবিকে সহজে কেউ পাত্তা দেয় না, চারিদিক থেকে তার ভাগ্যে জোটে শুধু অনাদর, উদাসীনতা। ছেলেমানুষ কবি হতাশা ও অভিমানে জর্জরিত হয়ে যায়।

আমি এ হতাশা ও অভিমানকে প্রশ্রয় দিই নি।

নতুন কবির উপর জগৎ অকথ্যরকম নিষ্ঠুর, নতুন কবিকে সবাই গায়ের জোরে সাহিত্যের আসরের বাইরে ঠেলে রাখে— এটাকে খাঁটি নির্জলা সত্য বলে মানতে আমি প্রথম থেকে অস্বীকার করেছি। কবি বেঁচে থাকতে তার দিকে কেউ ফিরে তাকায় নি, মৃত্যুর পর সেই কবিকে নিয়ে চারিদিকে হৈ চৈ হয়েছে— এরকম দৃষ্টান্ত আছে বৈকি ইতিহাসে। কিন্তু তবু আমি মানতে পারি নি যে দোষটা শুধু একপক্ষের, কবির কোন অপরাধ ছিল না।

শুধু লিখেই কবি খালাস, একথা নতুন কবি কেন ভাববে? কেন তার নতুন ভাব ভাষা ছন্দ জীবনদর্শনকে যেচে এসে জেনে বুঝে নেবার বরাত জগতকে দিয়ে নিজে অভিমানে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে? কেন সে এই সহজ বাস্তব সত্যটা উপলব্ধি করবে না যে নতুন রকম কবিতা বলেই সে কবিতাকে জানিয়ে চিনিয়ে দেবার দায়িত্ব নতুন কবির কম নয়?

নতুন কবি— জগৎ তো উদাসীন হবেই তার সম্পর্কে! সেটা শুধু স্বাভাবিক নয়, সঙ্গত। এ একটা নিয়ম মাত্র— একে উদাসীনতা বা অনাদর মনে করাও ভুল।

নতুন কবির উপর মানুষ উদাসীনও নয়, নিষ্ঠুরও নয়। বরং নতুন কবির দিকেই বেশ খানিকটা পক্ষপাতী। তা না হলে নিরুপায় অসহায়ের মত নিশ্চেষ্ট হয়ে ঘরের

কোনে বসে থেকেও কাব্যজগতে যুগে যুগে এত নতুন কবির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হত না। তরুণ বয়সের লাজুক ভীরু অভিমানী কবিদের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য জগতের হত না।

নতুন কবিকে লোকে চিনবে না, তার কবিতাকে আদরও করবে না— এটাই তো উচিৎ আর স্বাভাবিক! এই সহজ বাস্তব সত্যটা মেনে নেওয়ার বদলে এজন্য বিচলিত হওয়া শুধু বোকামি নয়,— ছেলেমানুষী আহ্লাদীপনা!

কবিতা বাজারের মাল নয়, কাজেই তার জন্য প্রচার বা বিজ্ঞাপন দরকার নেই: এ কথার ফাঁকি কুড়ি একুশ বছর বয়সেই আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল। অদৃষ্টবাদী ভাববাদী কবি নিজের কবিতার প্রচার জোরের সঙ্গে চালাতে ভয় পান, কারণ প্রচার মানে তিনি জেনে নিয়েছেন একমাত্র মাল কাটাবার সস্তা ফাঁকিবাজী বিজ্ঞাপন। পাছে লোকে নামের কাঙাল ভাবে এই ভয়ে তাকে উদাসীন সেজে থাকতে হয়। নিজেকে জাহির করার সস্তা কৌশল— খাতিরের মূল্যে নিজের লেখার প্রশংসা করানো— এর সঙ্গে নিজের সৃষ্টির দিকে দশজনের দৃষ্টি আকর্ষণের সুস্থ স্বাভাবিক চেষ্টা তার কাছে একাকার।

প্রত্যেক কবিই প্রচার চায়— নইলে কবিতা লেখার কোন মানে হয় না।

নীরব কবিরাই জগতের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে হাস্যাস্পদ।

আমি কিছুমাত্র দ্বিধা না করে নিজের কবিতা প্রচারের অভিযান চালিয়ে এসেছি। আমি মস্ত কবি, রবীন্দ্রনাথকে ডিঙিয়ে আমি হাজার বছর এগিয়ে গেছি, আমার কবিতার তুলনা নেই,— এসব মাল কাটানো বিজ্ঞাপনী প্রচার নয়। খাতিরের চাপ দিয়ে কবিতার প্রশংসা করানোও নয়—যদিও এটা আমি খুব বড় স্কেলে করতে পারতাম।

শুধু প্রচার। সসঙ্কোচে আশানিরাশার নাগরদোলায় হিমশিম খেতে খেতে অজ্ঞাত অখ্যাত নতুন কবি ডাকে বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদকের কাছে একটি বা দুটি কবিতা পাঠায় যে প্রচার চেয়ে— কবির দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তেজের সঙ্গে জোরের সঙ্গে ব্যাপকভাবে সার্থক-ভাবে সেই প্রচার।

দয়া করে সম্পাদক যদি কবিতাটি ছাপান এবং দয়া করে দশজনে যদি পড়েন এবং ভাগ্যক্রমে যদি আমার প্রতিভা ধরা পড়ে যায়.........

কুড়ি একুশ বছর বয়সেই ছি ছি করে উঠেছে আমার মন! একটি কবিতা লেখা কত শত বা কত হাজার মায়ের সন্তান প্রসবের প্রাণান্তকর পরিশ্রমের সামিল সেটা আমার জানা নেই, সে উদ্ভট উপমার হিসাবও কখনও কষতে বসি নি। কিন্তু কবিতা লিখে আমি তো জেনেছি কি করে মানুষ কবিতা লেখে। আমি তো জেনেছি কেন আর কি ভাবে মানুষ কবি হয়!

দেবতা দানব মহাপণ্ডিত মহাপুরুষ কারো রামায়ণ রচনার সাধ্য হয় নি কেন রত্নাকর ছাড়া, এ রহস্য আমার কাছে তো গোপন নেই। নোবেল-প্রাইজ পাবার পর দেশ রবীন্দ্রনাথকে সম্মান জানাতে গেলে রবীন্দ্রনাথ কেন সে সম্মানকে ঠিকমত অসম্মান করেছিলেন, পনের ষোল বছর বয়সেই আমি তো তা অনুভব করেছিলাম।

আমি তাই একদিকে যেমন প্রাণপাত করে কবিতা লিখেছি অন্যদিকে তেমনি প্রাণপাত করে চেষ্টা করেছি দেশের মানুষ যাতে আমার কবিতা পড়ে!

মানুষকে আমার কবিতা পড়াব— মানুষ পড়ে স্থির করবে আমার কবিতা কোন দরের। দৃঢ়ভাবে এই নীতি মেনে চলেছি বলে বিবেক আমাকে কখনো কামড়ায় নি, সস্তা আত্মপ্রচার হতে দিই নি বলে নিজের কাছে নিজেও আমি সস্তা হয়ে যাই নি।

অনেকে অবশ্য মনে করেছে অনেক রকম। কিন্তু মানুষের ভুল বোঝার আতঙ্কে বিচলিত হয়ে ভুল করার ধাত আমার নয়।

মানসী পর্যন্ত বলেছে, তোমার সত্যি লজ্জাসরম নেই। বড় বেহায়া তুমি!

আমি বলেছি, কবি হওয়া কি অপরাধ যে লজ্জায় কাঁচু-মাচু করব? নিজেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াব?

: তাই বলে এ ভাবে নিজেকে জাহির করবে !

ঘটনাটা বলি। কবিতা প্রকাশ আরম্ভ করার গোড়ার দিকের কথা— এখানে ওখানে সবে দু'চারটি কবিতা বেরিয়েছে। আমি খুব ভাল আবৃত্তি করতে পারি। গান শেখার মত আমি ছেলেবেলা থেকে আবৃত্তি শিখেছি। নানা সভায় নানা অনুষ্ঠানে আমাকে আবৃত্তি করতে বলা হয়। এতকাল আবৃত্তি করে শোনাতাম বিখ্যাত কবিদের রচনা। সেদিনের সভায়,— সভায় কম করেও হাজার দশেক লোক উপস্থিত ছিল— আমাকে রবীন্দ্রনাথের কোন একটি কবিতা আবৃত্তি করতে বলা হলেও নিজের একটি কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলাম।

সভাপতি ঘোষণা করেছিলেন : এবার শ্রীনবনাথ রায় রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আবৃত্তি করিবেন।

আমি আগেই কর্মকর্তাদের জানিয়ে দিয়েছিলাম যে আমি নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করব। তারপর সভাপতির এ ঘোষণা উচিত হয় নি।

মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আমি ঘোষণা করি : কবিগুরুর বহু কবিতা আমি বহুবার আবৃত্তি করেছি, ভবিষ্যতেও করব। আজ আমার স্বরচিত একটি কবিতা শোনাবার কথা ছিল, এটি শোনাবার জন্যই আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি।

কবিতাটির নাম ও রচনার তারিখ এবং প্রকাশিত ও

অপ্রকাশিত কবিতা নিয়ে আমার যে বইটি বার হচ্ছে, এ কবিতাটি যে তাতে স্থান পাবে এ কথাও আমি জানিয়ে দিই।

এটা বড়ই খারাপ লেগেছে মানসীর! আবৃত্তি শুনে সভা জমে গেছে, আবৃত্তির শেষে হাততালি ফেটে পড়েছে, চারিদিক থেকে দাবী উঠেছে আরেকটি আবৃত্তি শোনাবার— তবু মানসীর এটা ভাল লাগে নি!

: জাহির করা বলছ কেন? সভায় আবৃত্তি করার মত কবিতা আমি লিখেছি, শোনাব না কেন?

: একটু বিনয় তো থাকা উচিত? রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে বলা হল—

: সেটা আমার দোষ নয়। আর বলা হয়ে থাকলেই বা কি? এতে কি রবীন্দ্রনাথ ছোট হয়ে গেলেন? হাজার হাজার মানুষ তার কবিতা আবৃত্তি করে আসছে, পরেও করবে। ওসব তো আমাদের সম্পদ হয়ে গেছে, স্থায়ী জিনিষ। আমি না করলে আমার কবিতা আজ কে আবৃত্তি করবে? আমি কি ভেসে এসেছি!

: তুমি আর রবীন্দ্রনাথ!

: তাকে ছোট কোরো না। চারা মাথা তুলতে চাইলে গাছের অপমান করা হয় না। তিনিও নিজের কবিতা আবৃত্তি করতেন, নিজের লেখা গান গাইতেন। তিনিই পথ দেখিয়েছেন, সাহস দিয়েছেন।

: তবু—

এ তবুর মানে আমি জানি। এ নিছক সংস্কার—সাংস্কৃতিক কুসংস্কার! যে হেতু রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ এবং আমি নামহীন নগণ্য তরুণ সেইহেতু আমার নিজের কবিতার চেয়ে বেশী আপন ভাবতে হবে, বেশী খাতির করতে হবে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে! এ হল মহান আত্মলোপন,— মিথ্যা হলেও— উদারতা দেখিয়ে হতে হবে সুবোধ সুশীল বালক! নিজের ছেলেকে মানুষ জগতের অতীত ও বর্তমান সব ছেলের চেয়ে বেশী ভাল বাসবে এটা স্বাভাবিক ও সঙ্গত, এতে কারো আপত্তি নেই; রূপে গুণে মদনকে লজ্জা দেবার মত রাজপুত্র থাকতে কোন বাপ তার কালো ছেলেকে আদর করছে এর মধ্যে সম্রাটের অপমানের প্রশ্ন কেউ কল্পনাও করবে না; রবীন্দ্রনাথের কবিতার বদলে আমি আমার কবিতাকে তুলে ধরলে সেটা কিন্তু হবে রবীন্দ্রনাথকে অসম্মান করা!

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আজকের দিনের নতুন কবির কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। রবীন্দ্রনাথকে ছোট করা বড় করার প্রশ্নটাই হাস্যকর।

কিন্তু কুসংস্কার যাবে কোথা!

মানসী ভাগ্যে আমাকে অকৃতজ্ঞ বলে নি!

আমার কবিতা লেখার প্রেরণার বড় উৎস রবীন্দ্রনাথ, সেটা তো আছেই। এটা শুধু আমার বেলা নয়, সবরকমের

সব কবির বেলাই সত্য। রবীন্দ্রনাথের কাছে কবিতা লেখার প্রেরণা পাই নি— একথা বলা যে-কোন কবির পক্ষে চ্যাংড়ামি।

একথা বলার অর্থ আমি বাংলা দেশে জন্মাই নি, বাংলার জলমাটিতে বাঙালী সমাজের খাদ্য খেয়ে শিক্ষা পেয়ে মানুষ হই নি— আমি স্বয়ম্ভূ অথবা আমি পরগাছা।

পরগাছার নিস্তার নেই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য রস সব গাছের কোষে। পরগাছাকেও সেই মেশাল রস টেনে পুষ্ট হতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের একেবারে বিপরীত খাতে সম্পূর্ণ অমিল ধারায় কাব্য সৃষ্টি আলাদা কথা। সে অধিকার সবার আছে, আমিও সম্পূর্ণ নতুন পৃথক জীবনদর্শন রূপায়িত করছি আমার কবিতায়। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্য কবিতা লেখার প্রেরণা যোগায় নি একথা বলার সাধ্য আমার নেই— অন্য কারো আছে আমি বিশ্বাস করি না।

এদিক দিয়ে নয়। মানসী আমাকে অন্য দিকে অকৃতজ্ঞ বলতে পারত।

আমার মুখে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবৃত্তি শুনে মানসী আমার সঙ্গে যেচে এসে পরিচয় করে।

রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে শুনতে তার নাকি জীবনে বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। আঁধার রাতে কোথায় কোন বাপ-মা-ছাড়া অসহায় বিড়াল-ছানা সুর করে বিনিয়ে বিনিয়ে

কাঁদছে— এই যদি রবীন্দ্রনাথের দান হয় তবে আর কিসের ভরসায় বেঁচে থাকা ?

আমার আবৃত্তি শুনে সে স্বস্তি ফিরে পেয়েছে। সে প্রায় ভুলে যেতে বসেছিল এরকম সৃষ্টিও রবীন্দ্রনাথের আছে— প্রচুর আছে।

: সত্যি মুষড়ে যাচ্ছিলাম। রবীন্দ্রনাথের বই পড়তে ইচ্ছা হত না। কি হবে পড়ে ? আরও ঝিমিয়ে যাব, আরও খারাপ লাগবে। আপনার আবৃত্তি শুনে বাড়ী গিয়েই আবার বই নিয়ে বসলাম, বেশ বুঝলাম রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও চোরাকারবার চলছে।

: চলবে না ? ভাতকাপড়ের চোরাকারবার যদি চলে, শিল্পসাহিত্য কখনো বাদ যায় ? কবিতার জাত থাকে ? এসবের মধ্যে গাঁটছড়া বাঁধা। আপনারা ছেলেমানুষ, যেমন হালকা তেমনি নরম। কর্তারা যে রসে মজাতে চান সেই রসেই মজে যান। কিছুদিন জাতীয়সঙ্গীত শোনালে আপনারা দেশের জন্য ক্ষেপে ওঠেন। আবার কিছুদিন বেড়াল ছানার বৈরাগ্যের কাঁদুনি শোনালে ভাবেন, নাঃ, বেঁচে থাকা মিছে। নইলে এমন সস্তা সিনেমা দেখিয়ে দেখিয়ে আপনাদের এত সস্তা করে দেওয়া যেত ?

মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল মানসীর।

: ও বাবা, আপনি বক্তাও নাকি ?

: আপনাকে বলি নি। আপনারা মানে সাধারণ দশজন

—আপনি ওরকম নাও হতে পারেন। আপনাকে তো জানি না আমি।

: ও মানেটা বুঝেছি। ওবেলা চা খেতে আসুন না? ঠিকানা দিচ্ছি।

: মাপ করবেন। ওবেলা কাজ আছে।

মানসীর মুখ আবার লাল হয়ে গিয়েছিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বলেছিল, কবে আসবেন?

: সে তো ঠিক করে বলা মুস্কিল!

: ও!

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিল মানসী। মৃদু হেসে ব্যঙ্গের সুরে বলেছিল, দেখুন, এসব ট্যাকটিক্স আমার জানা আছে। বয়সে ছোট হব না আপনার চেয়ে— আপনাদের না হোক, মেয়েদের বেশ খানিকটা অভিজ্ঞতা জন্মায় এ বয়সে।

আমি বলেছিলাম, চললেন? মাথা ঠাণ্ডা করে একটু শুনে গেলে হত না আমার অসুবিধা কি?

যেতে যেতে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, বলুন।

: কাল আমি বাইরে যাচ্ছি, দার্জিলিং। কবে ফিরব ঠিক নেই। কবে আপনার ওখানে যেতে পারব ঠিক করে বলাটাও তাই মুস্কিল হচ্ছে। এর মধ্যে কোন ট্যাকটিক্স নেই।

: ও! তাই বলুন।

: তাই তো বলছিলাম— শেষপর্যন্ত শুনলেন কই?

কাঁদছে— এই যদি রবীন্দ্রনাথের দান হয় তবে আর কিসের ভরসায় বেঁচে থাকা ?

আমার আবৃত্তি শুনে সে স্বস্তি ফিরে পেয়েছে। সে প্রায় ভুলে যেতে বসেছিল এরকম সৃষ্টিও রবীন্দ্রনাথের আছে— প্রচুর আছে।

: সত্যি মুষড়ে যাচ্ছিলাম। রবীন্দ্রনাথের বই পড়তে ইচ্ছা হত না। কি হবে পড়ে ? আরও ঝিমিয়ে যাব, আরও খারাপ লাগবে। আপনার আবৃত্তি শুনে বাড়ী গিয়েই আবার বই নিয়ে বসলাম, বেশ বুঝলাম রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও চোরাকারবার চলছে।

: চলবে না ? ভাতকাপড়ের চোরাকারবার যদি চলে, শিল্পসাহিত্য কখনো বাদ যায় ? কবিতার জাত থাকে ? এসবের মধ্যে গাঁটছড়া বাঁধা। আপনারা ছেলেমানুষ, যেমন হালকা তেমনি নরম। কর্তারা যে রসে মজাতে চান সেই রসেই মজে যান। কিছুদিন জাতীয়সঙ্গীত শোনালে আপনারা দেশের জন্য ক্ষেপে ওঠেন। আবার কিছুদিন বেড়াল ছানার বৈরাগ্যের কাঁদুনি শোনালে ভাবেন, নাঃ, বেঁচে থাকা মিছে। নইলে এমন সস্তা সিনেমা দেখিয়ে দেখিয়ে আপনাদের এত সস্তা করে দেওয়া যেত ?

মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল মানসীর।

: ও বাবা, আপনি বক্তাও নাকি ?

: আপনাকে বলি নি। আপনারা মানে সাধারণ দশজন

—আপনি ওরকম নাও হতে পারেন। আপনাকে তো জানি না আমি।

: ও মানেটা বুঝেছি। ওবেলা চা খেতে আসুন না? ঠিকানা দিচ্ছি।

: মাপ করবেন। ওবেলা কাজ আছে।

মানসীর মুখ আবার লাল হয়ে গিয়েছিল। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বলেছিল, কবে আসবেন?

: সে তো ঠিক করে বলা মুস্কিল!

: ও!

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিল মানসী। মৃদু হেসে ব্যঙ্গের সুরে বলেছিল, দেখুন, এসব ট্যাকটিক্স আমার জানা আছে। বয়সে ছোট হব না আপনার চেয়ে— আপনাদের না হোক, মেয়েদের বেশ খানিকটা অভিজ্ঞতা জন্মায় এ বয়সে।

আমি বলেছিলাম, চললেন? মাথা ঠাণ্ডা করে একটু শুনে গেলে হত না আমার অসুবিধা কি?

যেতে যেতে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, বলুন।

: কাল আমি বাইরে যাচ্ছি, দার্জিলিং। কবে ফিরব ঠিক নেই। কবে আপনার ওখানে যেতে পারব ঠিক করে বলাটাও তাই মুস্কিল হচ্ছে। এর মধ্যে কোন ট্যাকটিক্স নেই।

: ও! তাই বলুন।

: তাই তো বলছিলাম— শেষপর্যন্ত শুনলেন কই?

দুই

বাইরে গিয়েছিলাম কাজ নিয়ে। রোজগার করতে।

গ্রীষ্মের ছুটি সুরু হবার আগে থেকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, মুখেও সকলকে বলে রেখেছিলাম যে ছুটির সময়টা মাইনে দিয়ে আমায় খাটিয়ে নেওয়া যাবে।

বৌদি মুখ অন্ধকার করে বলেছিলেন, ঠাকুরপো, কি এমন অভাব তোমার যে, পয়সা রোজগারের জন্য পাগল হয়ে উঠলে? এখন ছুটকো পয়সার দিকে মন না দিয়ে পরে যাতে রোজগারটা ভালো হয় সেদিকে মন দিলে হত না?

: আমার একটা বিশেষ দরকার।

: কিসে তোমার টাকার দরকার বল, আমি তোমায় টাকা দেব।

: কবিতার বই ছাপাব।

: কবিতার বই ছাপাবে! তোমার যে কত পাগলামী।

বৌদি আর কিছু বলেন নি। তার কাছে আমার কবিতার বই ছাপাতে চাওয়ার কোন মানেই হয় না!

বিজ্ঞাপনে কাজ হয় নি। দু'চারখানা চিঠি এসেছিল, ছেলে পড়ানোর কাজ, মাসিক বেতন দশ পনের টাকা।

গৃহ শিক্ষকেরই কাজ তবে একটা জুটিয়ে দিয়েছিল তৃপ্তি।

মোটা মাইনের কাজ—আমার পক্ষে আশাতীত। মস্ত ব্যবসায়ী হারানবাবু সপরিবারে দার্জিলিং বেড়াতে যাবেন, তার ছোট দুটি ছেলেমেয়েকে পড়াতে, খেলাতে এবং সাধারণভাবে দেখাশোনা করতে আমায় সঙ্গে যেতে হবে।

হারানের ছেলে অবনী তৃপ্তিকেই কাজটা দিতে চেয়েছিল। সাত বছরের একটি মেয়ে আর দু'বছরের একটি ছেলেকে পড়ানোর মত বিদ্যা হয় তো তৃপ্তির আছে, তিন বছর আগে সে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। কিন্তু তৃপ্তি রাজী হয় নি।

বিয়ের জন্যই তার ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়া। কেরানী বাপদাদা তিনবছর তার বিয়ের চেষ্টা করছে এবং সে ঘরে বসে আছে বিয়ে-না-হওয়া বেকার মেয়ে হয়ে। স্বাধীনভাবে রোজগারের সুযোগ পেলে তার নেওয়াই উচিত। তৃপ্তি তা মানে। কিন্তু মস্ত একটা কিন্তু আছে। বাড়ীর সকলের সঙ্গে মর্মান্তিক ঝগড়া করতে হবে—সেটা আসল কথা নয়। তার কিন্তুটা ভিন্ন।

এটা তার পথ নয়।

অবনী না হয় গায়ের জোরে তাকে এই কাজটা জুটিয়ে দিল এক মাস দেড় মাসের জন্য। তারপর?

তারপর সে কোনদিকে যাবে?

একমাস দেড়মাস চাকরী করে এসে আবার সরলা

অবলা বালিকা সেজে ঘরের কোণে মুখ গুঁজে অপেক্ষা করবে বাপভায়ের জুঠিয়ে দেওয়া সুপাত্রের ?

তার চেয়ে যেমন আছে তেমনি থাকাই ভাল ! মানুষের একটাই পথ থাকা উচিত। তবে আমাকে কাজটা দিলে সে খুসী হবে। সত্যই খুসী হবে।

তৃপ্তি হেসে বলেছিল, শুনে বলল কি জানো নব'দা ? মুখে আটকাল না, সোজাসুজি পষ্টাপষ্টি জিজ্ঞেস করে বসলো, তুমি ওর জন্য অপেক্ষা করছ নাকি ? পাশটাশ করে মানুষ হতে ওর তো অনেক বছর দেরী।

আমিও হেসেছিলাম।

: আরও কি বলল শুনবে ? বলল, নব তো ছেলেমানুষ, তোমার চেয়ে বেশী বড় তো হবে না ? তুমি যে বুড়িয়ে যাবে নব মানুষ হতে হতে ! বিশ্রী বেমানান হবে তোমাদের মধ্যে !

: তুমি কি বললে ?

: আমি বললাম, নবটব জানি না। বাবা যাকে জুটিয়ে দেবেন আমি তারি দাসী হব। তোমাকে জোটান, নবকে জোটান কিম্বা বিড়লাকে জোটান— আমার বাছবিচার নেই।

: বলেছিলে ? বলতে পেরেছিলে ?

: কেন পারব না ? সুপাত্রের জন্য আমরা জবুথবু লাজুক মেয়ে সেজে থাকি বলে কি আমরা বোকাহাঁদা ?

তৃপ্তি আঁচলের কোন গহন আড়াল থেকে একটি পান

বার করে মুখে পুরেছিল। তার দৈনিক পানের বরাদ্দ বাঁধাধরা। আমি মাঝে মধ্যে তাকে কয়েকটি বাড়তি পান এনে দিয়ে সস্তায় খাঁটি কৃতজ্ঞতা অর্জন করতাম।

: নেবে নাকি কাজটা? আমি বলি, নিয়ে নাও। অপমান হবে না, আদর যত্নই করবে। তুমি না নাও আরেকজন নেবে। তার হয়তো বৌ ছেলেমেয়ের দায়, তোমার দায়টাও তো কম নয়, কবিতার বই ছাপানোর দায়! যদিবা অপমান কিছু জোটে, অন্য একটা মানুষ যা মুখ বুজে সইবে, তুমি তা সইবে না কেন?

: তুমি আমাকে কাজটা নেওয়াতে চাও?

: চাই। তুমি কথায় ভারি বস্তুবাদী হয়েছ। কাজে একটু হয়ে দেখিয়ে দাও।

হারানবাবু আমায় দেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিলেন, আরে, তুমি নাকি? তা বেশ বেশ। তোমারও রোজগারের দরকার হল! তা বেশ বেশ। বাবা ভাল আছেন? তোমার দাদা বুঝি এখন— ? ও হ্যাঁ, ইনকামের হিসাবটা কষার মধ্যে সেও ছিল বটে। তা, তুমি পারবে তো বাবা? হারামজাদা হারামজাদি দুটো আসল সয়তান!

একটা চুরুট ধরিয়ে ফেল্লেন!

: তা বেশ, বেশ। তুমি করতে চাইলে কাজটা আমি কি আর কাউকে দিতে পারি?

লক্ষ্মী আর লক্ষণ— আমার ছাত্রী আর ছাত্র। বাপ অসত্য উপায়ে পয়সা রোজগার করলে সাতবছরের মেয়ে আর ছ'বছরের ছেলে পর্যন্ত কেন আর কি ভাবে এমন অসভ্য হয়, সেবার সেটা টের পেয়েছিলাম।

সব আছে প্রচুর পরিমাণে, না চাইতে সব পেয়ে যায়,— তবু কচি কচি মন দু'টি যেন হিংসার আড়ত। মিথ্যা কথা মুখে লেগেই আছে— কারণে এবং অকারণেও। রাগ হলেই চরমে উঠে যায়— রাগবার জন্যে সর্বদাই যেন দু'জনে উদ্যত হয়ে থাকে। এদিকে এত ভীরু যে জাগ্রত অবস্থায় ঘর এক মুহূর্তের জন্য অন্ধকার করলে হাউ মাউ করে ওঠে— ঘরে যত লোকই থাক !

মাইনেটা মোটা— কাজটাও প্রাণান্তকর। সে হিসাবে বেশী নয় মোটেই।

যতই দুরন্ত হোক শাসনের নিষ্ঠুরতা দিয়ে ছেলেমেয়েকে দমন করা আমার মতে পাপ— ঘরোয়া দমননীতি মনুষ্যত্বের গোড়া আলগা করে দেয়।

কিন্তু এরা দু'জন দুরন্ত নয়, বিকারগ্রস্থ। বিকৃত অস্বাভাবিক পরিবেশ এদের বিগড়ে দিয়েছে।

মনে পড়ে, দ্বিতীয় দিনেই পড়ার সময় লক্ষ্মীর হাতের পুতুলটা কেড়ে নিতে যাওয়ায় সে কামড়ে আমার হাত থেকে রক্ত বার করে দিয়েছিল।

দুদিনেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল আমার সমস্যা। হয়

বর্বরের মত নিষ্ঠুর হওয়া, নতুবা কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ী ফিরে যাওয়া।

সেদিন এ সমস্যার মীমাংসা করতে যে নীতি খাটিয়েছিলাম, আমার কবি জীবনে চিরদিন সকল সমস্যার হিসাব নিকাশ সেই একই নীতিতে হয়ে এসেছে।

রাত্রে বসে বসে ভাবছিলাম কি করা উচিত। গা বাঁচিয়ে ফাঁকি আর জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে গেলে পরের পয়সায় রাজভোগ খেয়ে গরমের ছুটিটা দার্জিলিং-এ সুখেই কাটানো যায়— কিছু টাকাও পকেটে আসে। কিন্তু সে তো আর সম্ভব নয় আমার পক্ষে। পুঁথির নীতিকথার হিসাবে নয়, আমার বাস্তব হিসাবেই ওটা লাভ নয়— নিছক লোকসান।

নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার চেয়ে বোকামি জগতে কি আছে?

আমাকে সোজাসুজি ঠিক করতে হবে: নিষ্ঠুর হওয়া উচিত কিনা এবং ওরকম নিষ্ঠুর আমি হতে পারব কি না।

ফুলের মত মুখখানা লক্ষ্মীর, লক্ষণের বড় বড় আশ্চর্য দু'টি চোখ। বিকার যতই থাক, দু'জনে ওরা শিশুই। ওদের মনে অন্ধকারের ভয়ের মতই আমার সম্পর্কে আতঙ্ক সৃষ্টি করা ঠিক হবে কি? দিনের পর দিন দুটি শিশুকে শুধু ভয়ে দমিয়ে রাখা আমার সহ্য হবে কি?

ওদের আপনও করা যায়, সংশোধনও করা যায়। কিন্তু

সেটা অনেকদিনের দীর্ঘ প্রক্রিয়া। গরমের ছুটির মধ্যে তো সেটা সম্ভব নয়।

হৃদয়হীন বর্বরতা ছাড়া পথ নেই।

আসল কথাটা ধরতে পারছিলাম না। ছোট ছেলেমেয়ে আমি বড় ভালবাসি, সেজন্য আরও বেশী অসুবিধা হচ্ছিল।

রাত্রে খেতে বসেও ভাবছিলাম। হারানের স্ত্রী সর্বাঙ্গে গয়না পরে এবং তার সেজ মেয়ে রমা আধুনিক বেশে খাওয়া দেখতে এলেন।

লক্ষ্মীর মা বললেন, ও দুটোকে তুমি নাকি সামলাতে পারছ না বাবা?

রমা বলল, অত নরম হলে কি চলে?

লক্ষ্মীর মা বললেন, তুমি ভাবতে পার, বেশী শাসন করলে আমরা রাগ করব। সে ভয় কোরো না। আমরা শাসন চাই। শাসন ছাড়া কি ছেলেপিলে মানুষ হয়? শাসন করতে পারে নি বলেই আগের দু'জন মাষ্টারকে আমরা ছাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আদর যা দেবার আমরা দেব, তোমার কাজ শাসন করা, তুমি শাসন করবে।

রমার বছর দেড়েকের একটি ছেলে আছে। ছেলেটিকে রাখার জন্য মাঝবয়সী মোটাসোটা একটি স্ত্রীলোককে রাখা হয়েছে। শোবার ঘর থেকে রমার ছেলেটির জোরালো কান্না শোনা যাচ্ছিল। আচমকা তার কান্না থেমে গেল।

লক্ষ্মীর মা আবার বললেন, কেন, উনি তোমাকে বলে

দেন নি যে খুব কড়া শাসন করবে? শাসন করার জন্যই তোমাকে রাখা?

: কি করা যায় সে কথাই ভাবছিলাম।

রমা হেসে বলেছিল, পালিয়ে যাবার কথা ভাবছেন না তো?

সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখে কবিতা লিখতে বসেছিলাম: যে নিষ্ঠুর সাধ শিশু চেয়ে কেঁদে কেঁদে মরে……

অনেক রাত্রে রমা ঘরে এসে বলেছিল, এখনো জেগে আছেন? চুপি চুপি একটা কথা বলতে এলাম। শাসন করার ঢালাও হুকুম দিয়েছে বলেই সত্যি সত্যি বেশী শাসন করতে যাবেন না যেন! বুঝেছেন?

: বুঝেছি বৈ কি।

: কি করবেন বলে দিচ্ছি। ভয় দেখাবেন। ওদের কলকাতার মাষ্টার শুধু ভয় দেখিয়ে ওদের জব্দ রাখত। এমন ভয় দেখাবেন যাতে আপনাকে দেখলেই কাঁপতে থাকে। এটা কি লিখছেন? কবিতা নাকি? আপনি কবিতা লেখেন! শোনাবেন একটা?

: এখন লিখি, কাল শোনাব।

মন স্থির করতে তারপর আর অসুবিধা হয় নি। যে আসল কথাটি এতক্ষণ ধরতে পারি নি সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ্মী আর লক্ষ্মণের জীবনে আমার ছদিনের অতি অস্থায়ী আবির্ভাব। আমি ওদের জীবনের মোড়

ঘুরিয়ে দিতে আসি নি। এতদিন যে ভাবে ওদের দিন কেটেছে, যে ভাবে ওরা বড় হয়েছে, তেমনিভাবেই ওদের দিন কাটবে, তেমনিভাবেই ওরা বড় হবে— সাময়িকভাবে তুদিনের জন্য জের টেনে চলা ছাড়া কিছুই আমার করার নেই।

আমার নিষ্ঠুরতা নতুন কিছুই হবে না ওদের কাছে।

আগের দিন সখ করে একখানি ভুজালি কিনেছিলাম। পরদিন ছাত্রছাত্রীর প্রথম অবাধ্যতায় আসুরিক ক্রোধের অভিনয় করে সেই চকচকে ভুজালি দিয়ে যখন কেটে ফেলে দিতে গিয়েছিলাম তু'জনের গলা, আতঙ্কে কেঁদে উঠতে গেলে সেই ভুজালির ভয় দেখিয়েই যখন থামিয়ে দিয়েছিলাম কান্না— লক্ষ্মীর তখনকার মুখের ছবি আমার মনে চিরতরে আঁকা হয়ে গেছে।

এই ছবিরই প্রতিচ্ছবি একদিন দেখেছিলাম মানসীর মুখে।

বুকে আঁচড় লেগেছিল। কিন্তু অনুতাপ করি নি। সংসার চিরদিন যা দিয়ে এসেছে শিশু তু'টিকে, আমিও সেটুকুই দিয়েছি তাদের। প্রতিকার বা প্রতিরোধের প্রশ্নও ছিল না।

লক্ষ্মী বা লক্ষণের কিছুমাত্র লাভ বা লোকসান হয় নি আমার ব্যবহারে। আমার দিক থেকে অতি কঠিন একটা কাজ আমাকে করতে হয়েছিল, এইমাত্র।

হারান বলেছিলেন, তুমি নাকি ভুজালি দিয়ে কাটতে গিয়েছিলে ছেলেমেয়ে দুটোকে ? বেশ করেছিলে, বেশ করেছিলে। মার ধোর আমি পছন্দ করি নে! এমনি কৌশলে শিক্ষা দেবে, এই তো আমি চাই! গায়ে আঁচরটি লাগল না, শাসনটি হল ঠিক মত।

হা হা করে তিনি হেসেছিলেন।

এটাই বোধ হয় ছেলেমেয়ে শাসনের জন্য অহিংস নীতির ঘরোয়া বাস্তব সংস্করণ ? কে জানে!

লক্ষ্মী জানত, সত্যি সত্যি গলাটা তার আমি কাটব না কিন্তু জানলেও ভয় পেতে বাধা ছিল না, ভয় না পেয়ে উপায়ও ছিল না। চারিদিকে গা ঘেঁষে মানুষ বসে আছে জানলেও ঘর অন্ধকার করে দিলে আতঙ্কে না কেঁদে সে পারত না।

তারপর লক্ষ্মী আমার শাসন মেনে নিয়েছিল। তখন পর্যন্ত লক্ষ্মণ সব ব্যাপারে দিদিকেই অনুসরণ করত।

পরদিন সকালে তাদের পড়াতে বসে ইতিহাসের গল্প শোনাতে গিয়েছিলাম— বিখ্যাত বীর নারীদের গল্প।

: গল্প শুনতে চাই না। পড়ান।

অর্থাৎ লক্ষ্মী শাসন মেনে নিয়েছিল কিন্তু আপোষ করে নি! যতদিন দার্জিলিং ছিলাম ততদিন তো নয়ই, কলকাতা ফেরার মাস দু'য়েক পরে যখন একবার দেখা হয়েছিল তখনও নয়!

আমাকে সে একরকম স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে বন্ধুত্ব করতে এসো না, তুমি মাইনে করা মাষ্টার, যেটুকু তোমার কাজ সেইটুকু শুধু করে যাও!

ভয় লোভ হিংসা আর মিথ্যা কথার ডিপো দশএগার বছরের মেয়ে, চরিত্রের আশ্চর্য দৃঢ়তার মত এমন একগুঁয়েমি পায় কোথা? প্রচুর মাছ দুধ ছানা মাখন ছাঁকা ছাঁকা খাবার খেয়ে মানুষ হলে এটা আপনা থেকেই হয়! আসলে এ তো চরিত্রের দৃঢ়তা নয়, নিছক প্রাণশক্তির একটা বিকার। রাগ হয়েছে, জ্বালা হয়েছে কিন্তু সক্রিয় প্রতিরোধের সাহস নেই। আমার সঙ্গে ভাব না করে আমায় যদি একটু জব্দ করা যায়, এই নিষ্ক্রিয় নিরাপদ উপায় অবলম্বন করা। প্রচুর খাদ্য যথেষ্ট প্রাণশক্তি না যোগালে এটুকুও সম্ভব হত না লক্ষ্মীর পক্ষে। খাদ্য থেকে একগুঁয়ে অভিমান, কবির মুখে কথাটা হয় তো বেখাপ্পা শোনাবে। কিন্তু সত্য কথা না বলে উপায় কি!

অবশ্য লুকিয়ে অন্য প্রতিশোধ নিতেও লক্ষ্মী ছাড়ে নি। আমার কবিতার খাতায় প্রতি পৃষ্ঠায় কালি ঢেলে দিয়েছিল, জামা কাপড় কাঁচি দিয়ে কুচি কুচি করে কেটেছিল।

তিন

কলকাতা ফিরেই নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিলাম মানসীর।

তার বাবা মস্ত ডাক্তার। তার দাদা মস্ত আই. সি. এস অফিসার। বাড়ীটা মস্ত এবং বাড়ীতে অনেক লোক।

গিয়ে দেখি, আমার আগেই উদীয়মান তরুণ কবি সুময় আসর জমিয়ে বসেছেন। আমার চেয়ে কয়েকবছর বয়সে বড়, সৌম্যসুন্দর মুখ, শান্ত উদাস দৃষ্টি। গায়ে লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবী, কাঁধে ভাঁজ করা চাদর। কোনদিন আমি তার বেশ বা চেহারার বাইরের কোন পরিবর্তন দেখতে পাই নি, শীতকালে শুধু সুতীর বদলে গরম কাপড়ের পাঞ্জাবী ওঠে, কাঁধে গ্রীষ্মকালের সুতী বা সিল্কের চাদরটির বদলে গরম চাদর তেমনিভাবে ভাঁজ করা থাকে।

ক্রমে ক্রমে তার আরও নাম হয়েছে। তার কবিতায় অনুভূতি ও কল্পনার দিগন্তস্পর্শী এক ব্যাপকতা ও দূরত্ব আছে ; অনেক উঁচু থেকে যেন তিনি তাকিয়ে আছেন জীবন সমুদ্রের দিকে— তার কবিতা জীবন সমুদ্রের মতই বিরাট ও বিস্তৃত কিন্তু একটু কুয়াশা ঢাকা, প্রশান্ত আর তরঙ্গহীন।

মনে পড়ে, মানসীর সামনে সুময়কে মুখোমুখি দেখেই আমার মনে হয়েছিল, বাঃ, এদের দু'জনকে তো বেশ মানায় !

বিখ্যাত সাহিত্যিক অটলবাবু উপস্থিত ছিলেন, মানসীর সেই বিশেষ পার্টিতে বোধ হয় একমাত্র তিনিই ছিলেন প্রবীণ ব্যক্তি। আরও কয়েকজন নামকরা বয়স্ক কবিসাহিত্যিকের সঙ্গে মানসীর জানাশোনা ছিল, কিন্তু সে নাকি তাদের ডাকতে ভরসা পায় নি! অটলবাবুর সঙ্গে তার অন্যরকম সম্পর্ক— আগে অটলবাবু তাকে প্রাইভেট পড়াতেন।

আরও কয়েকজন উঠতে-ইচ্ছুক এবং উঠতি পর্যায়ের কমবয়সী কবি সাহিত্যিকও উপস্থিত ছিল— ছেলেরাই বেশী তার মধ্যে— তবে তারা প্রায় সকলেই তখনও ছাত্রছাত্রী পর্যায়ের, কবি সাহিত্যিক হিসাবে নগণ্য।

মানসী আমার পরিচয় দিয়েছিল: ইনি অদ্ভুত ভাল আবৃত্তি করতে পারেন!

অধীর বলেছিল, সেটা তুমি আজ জানলে নাকি!

অধীরের গায়ের সার্টটি ধোপ দুরস্ত কিন্তু সেলাই ও রিপুর চিহ্নগুলি প্রকাশ্য— গোপন করার চেষ্টা মাত্র নেই।

সুময় আমাকে বলেছিলেন, আমার একটা কবিতা আবৃত্তি করতে হবে কিন্তু!

: কোন কবিতা?

: সেটা তুমি বেছে নিও।

: আবৃত্তি করার মত কবিতা কি আপনার আছে?

আমি সরলভাবেই কথাটা বলেছিলাম। কিন্তু সুময়ের মুখ হয়ে গিয়েছিল লাল! অগত্যা আমাকে ব্যাখ্যা করে

বুঝিয়ে বলতে হয়েছিল যে ভাল হলেও সব কবিতা আবৃত্তি করার উপযোগী হয় না। নানান্ রকম কবিতা আছে তো! সব কবি তো একরকম কবিতা লেখেন না যে সকলের সব কবিতাই আবৃত্তি করলে জমবে!

মানসী বলেছিল, কেন, আবৃত্তি মানে মুখে কবিতা শোনানো। সব কবিতাই নিশ্চয় আবৃত্তি করা চলে।

আমি হেসে বলেছিলাম, আবৃত্তি মানে কি তাই আছে? যে কোন কবিতা ঠিকমত আউড়ে গেলেই আবৃত্তি করা হল? আবৃত্তির জন্য তা হলে কবিতা বাছা হত না— কয়েকটা কবিতা সব যায়গাতে সবাই আবৃত্তি করত না। ছন্দের বৈচিত্র্য, শব্দের ঝঙ্কার, ভাবানুভূতির ওঠানামা— এসব অনেক কিছু না থাকলে কি আবৃত্তি করলে জমে!

অটলবাবু বলেছিলেন, কথাটা যেন ঠিক মনে হচ্ছে। তাই হবে বোধ হয়। যেমন গান— সুর দিয়ে গাইতে হলে গান লিখতে হবে, কবিতা লিখলে চলবে কেন?

সুময় বলেছিল, গান কি কবিতা নয়?

মানসী বলেছিল, তাই তো! তবে?

আমি বলেছিলাম, সবই কবিতা। গোড়ার হিসাবে তাই দাঁড়ায়। কিন্তু ব্যবহার ভেদটা আকাশ-পাতাল বেড়ে গেছে তো। যেটা যে কাজের জন্য যে উদ্দেশ্যে দরকার সেইভাবে লিখতে হয়। আমি নিজের যে কবিতা আবৃত্তি করি সেটা আবৃত্তি করার জন্যই লিখি!

আপনি কবিতাও লেখেন!— মানসী সুময়ের দিকে তাকিয়েছিল— তাই আপনাদের দু'জনের দেখা হতেই তর্ক!

অটলবাবু বলেছিলেন, কিন্তু কবির লড়াই তো এরকম নয়!

অধীর বলেছিল, একটা কবিতা শোনান না?

মানসী তাড়াতাড়ি চেপে দিয়েছিল অনুরোধটা।

: চা এসে গেছে!

এক ফাঁকে মানসী সেদিন আমায় বলেছিল, ভুল করেছি। আপনাকে একা আসতে বললেই ভাল হত। পরে নয় একদিন এরকম—

: ক্ষতিটা কি হল? পাঁচজনের সঙ্গে মিশলেই লাভ!

: কাল একবার আসবেন?

: কাল? আচ্ছা।

ভুল মানসী করে নি, এরকম পাঁচজন কবি সাহিত্যিক-দের মজলিসেই সে আমায় ডেকেছিল প্রথম আলাপ পরিচয়ের জন্য। মনটাই এখন তার অন্যদিকে ঘুরে গিয়েছিল যে এভাবে নয়, আগে একলা একলা আমার সঙ্গে আলাপটা জমিয়ে নিতে হবে। কথাটা মনে হবার মধ্যে খাপছাড়া আর কিছুই ছিল না, শুধু আমার সঙ্গে একা একা পরিচয় করা দরকার এটুকু খেয়াল হওয়ার জন্যই সেদিন পাঁচজনকে ডেকে আনাটা তার কাছে দাঁড়িয়ে গেল— ভুল! আগে এ-ভাবে পাঁচজনের মধ্যে আলাপ করে নিয়ে পরে একা আলাপ করলে যেন বিশেষ কিছু এসে যায়।

প্রথম দিন মানসীর বিশেষ কোন প্রভাব অনুভব করি নি। শুধু সেই প্রথম দিন কেন, তার পরেও অনেকবার দেখাশোনা আলাপ পরিচয় হওয়ার মধ্যেও চিন্তিত হবার মত বিশেষ জোরালো আকর্ষণ বোধ করি নি। আপনি থেকে আমরা তুমিতে উঠে গিয়েছি কয়েক মাসের মধ্যেই, কিন্তু সে যেন শুধু ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের ভিত্তিতে। পরে এটা আমার সত্যই বিস্ময়কর মনে হয়েছে— পরে যখন ক্রমে ক্রমে টের পেয়েছি যে আমার জগৎ মানসীময় হয়ে গেছে।

প্রথম দিন তার চেহারাটি ভাল লেগেছিল— আর ভাল লেগেছিল তাকে আয়ত্ত করার জন্য অনেকের অনেক রকম 'ট্যাকটিক্স'এর অভিজ্ঞতার দরুণ ক্রুদ্ধ বিরক্ত তার সহজ কুঁতুলেপনা। অনেক ছেলে তার সঙ্গে ভাব করতে উৎসুক এটা মুখ ফুটে তার না বললেও চলত। তাকে দেখেই সেটা সহজে অনুমান করে নেওয়া যায়।

সুন্দর সুস্থ শরীর, মুখে সুশ্রী লাবণ্য, গভীর কালো চোখ। বেশের বাড়াবাড়ি নেই এটাই তার বাড়াবাড়ি মনে হয়! কারণ, বেশের সমারোহ থাকলে তার স্বাস্থ্য আর গড়ন আরও একটু চাপা পড়ে যেতে পারত।

সত্য কথা বলি, বহুদিন পর্যন্ত তার কাছে বিশেষ কিছু আশা করি নি, তাই এ আকর্ষণ কামনাও হয়ে ওঠে নি আমার মধ্যে। তার অপরূপ দেহটি প্রাকৃতিক ঘটনাচক্রের ফল মাত্র— এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুস্থ সতেজ জীবন-

বোধের আশাবাদী সংগ্রামী প্রকৃতির সমন্বয় আমি আশাও করি নি, খুঁজেও পাই নি অনেকদিন।

সাধারণ মেয়ের মতই নানা ভাবে মেশাল গড়ন পেয়েছিল তার মন, তেজের সঙ্গে দুর্ব্বলতা, বড় আশার সঙ্গে সস্তা হালকা সুখের লোভ, জীবনকে দামী মনে করার উদারতার সঙ্গে স্বার্থপরতার দীনতা। চল্‌তি নানা নীতি আর আদর্শ, নরমগরম সংস্কার আর বিদ্রোহ, ভাবভাবনা কাজ আর ফ্যাশন— সব কিছু থেকে সুযোগসই পছন্দসই কম বেশী খুঁটে খুঁটে নিয়ে নিজেকে গড়া।

আপশোষ জাগে নি, বিশেষ বিচলিতও হই নি কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত বার বার মনে হয়েছে যে এমন যার দেহের গড়ন, এমন সর্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য যার রূপে, তার মনের কোন সুনির্দিষ্ট গড়ন নেই, বৈশিষ্ট্য নেই!

তৃপ্তির মধ্যে বরং খানিকটা মানসিক সংগঠন দেখেছি— ঘরের কোণে সংসারের কাজে আটক থাকার জন্য যতই সঙ্কীর্ণ হোক তার মনটা। আমরা যাকে কবিতা বলি তার কিছুই সে বোঝে না: রামায়ণ মহাভারত, সাধারণ ছড়া ও পদ্য পর্যন্ত তার বোধশক্তির সীমা। হাতের কাছে বাংলা খবরের কাগজ পেলে সে বাছা বাছা কয়েকরকমের কয়েকটা খবরে চোখ বুলায়। কিন্তু যেটুকু সে বোঝে, জীবনের নিয়মনীতি আর মানে যেটুকু সে জানে এবং মানে, যত সংস্কার আর

অন্ধধারণা তার মন জুড়ে থাকে— তার মধ্যে মোটামুটি একটা শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আছে।

তার চিন্তা ভাবনা আশা আকাঙ্খা স্বপ্ন কল্পনা এলো-মেলো উল্টোপাল্টা নয়।

সে জানে তার রূপ আছে। আবার এটাও জানে যে নিজের স্বার্থে এই রূপকে কাজে লাগাবার উপায় তার নেই। এই রূপের জোরেই বড় জোর তার স্বচ্ছল ঘরে ভাল চাকুরে ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে। তার বেশী আর কিছু আশা করার অধিকার সে পায় নি।

সে জানে, রূপের জোরে পাড়ার মস্ত বড়লোক হারান বাবুর ছেলে অবনীকে সে যে বাগাতে পারে না এমন নয়— কিন্তু তাতে লাভ নেই। আজ তাকে বিয়ে করার জন্য অবনী পাগল কিন্তু বিয়ের পর অবনীর যাই হোক দুঃখ অশান্তির আগুনে পুড়ে তাকে সত্য সত্যই পাগল হতে হবে।

তৃপ্তি আমায় বলে, নবদা, যে মেয়েকে খুব বিয়ে করতে ইচ্ছে হবে কখনো তাকে বিয়ে কোরো না, খপর্দার!

: বিয়ে ছাড়া আর কোন ভাবনা নেই তোমাদের?

: কি করে থাকবে? বিয়ে ছাড়া আর কি আছে আমাদের?

মানসী কখনো মুখ ফুটে একথা বলতে পারে নি। সে বিশ্বাস করে না যে বিয়ে ছাড়া তারও গতি নেই। চাকরী? সে তো শুধু একটা গত্যন্তর!

তৃপ্তির বাপভাই তার জন্য এই গত্যন্তরের ব্যবস্থা করতে পারেন নি— মানসীর বাপভাই এ ব্যবস্থাটা করেছেন। গত্যন্তর হিসাবে নয়, বিয়েরই প্রয়োজনে।

তৃপ্তি আর মানসীর মধ্যে এই তুলনাটুকু তুলে ধরার উদ্দেশ্য বাংলার গরীব বড়লোক সেকেলে আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজের সমস্ত সাধারণ মেয়ের আসলে যে একই দশা এটা আরও একবার শুনিয়ে দেবার জন্য নয়। একথা অনেকে অনেকবার বলেছে— শত-শত গল্প উপন্যাসের এইটুকুই আসল ভিত্তি।

হঠাৎ এই পুরাণো পচা কথাটা যে টেনে এনেছি তার কারণ আছে। কথাটা পুরাণো হতে পারে কিন্তু এর একটা গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব দিক, একটা বিশেষ মর্ম, আজ পর্যন্ত আড়ালেই থেকে গেছে।

অতি কঠোর সত্য। কিন্তু এ সত্য সামনে না রাখলে মানসী আর আমার মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠার যে বিবরণ দিচ্ছিলাম তার আসল মানে বোঝা যাবে না : পরবর্তী পরিণতি সম্পর্কে তো কথাই নেই!

সমাজের যে মূল নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করে তৃপ্তি আর মানসীদের জীবন, দু'জনের কারো বেলা এতটুকু তারতম্য নেই সে নিয়মের— তারই অভিশাপ মানসীদের সুনির্দিষ্ট মানসিক গঠনের অভাব।

তৃপ্তিদের জীবন হয় পঙ্গু, সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে অগভীর কৃত্রিম সুখদুঃখের কারবার।

মানসীদের জীবন হয় আরও খানিকটা ছড়ানো এলো-মেলো বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিশেহারা আর আত্মবিরোধে জটিল। সেও তো সত্যিকারের মুক্তি পায় না। তৃপ্তি আর মানসীর জীবন সেই একই পরাধীনতার এপিঠ আর ওপিঠ।

বাইরে খানিকটা চলাফেরা, অনেকের সঙ্গে মেলামেশা, খানিকটা বাঁধাধরা বিদ্যা আর ছাঁচে ঢালা অভিজ্ঞতা— মানসীদের আসল পাওনা এইটুকুই। সংঘাতময় বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তারও আত্মীয়তা নিষিদ্ধ— দু'একটি ঢেউ শুধু গায়ে লাগতে পারে।

তারই মারাত্মক ফল হয় সঙ্গতিহীন স্বকীয়তাহীন বিচিত্র কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অনৈক্যময় চেতনার বিকাশ। আজ যা চরম সত্য, কাল তা কুৎসিত মিথ্যা মনে হয়। আজ যা জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা, কাল তার মূল্য খুঁজে পায় না।

কলেজ থেকে ফেরার পথে বাড়ীতে এসে মানসী বলত, তোমায় বাড়ীতে পাব ভাবি নি। ভালই হল। মনটা বড় ছটফট করছে। ভাবছিলাম বইখাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কোথাও চলে যাই। তোমার বাড়ীটা একবার ঘুরে গেলাম, যদি তুমি বাড়ী থাক! বেশ আছো, খুশীমত ফাঁকি দাও।

: ফাঁকি দিই না। ফাঁকি বাঁচিয়ে চলি। বেছে বেছে ক্লাস করি, যাতে কিছু লাভ আছে। যেটাতে শুধু সময় নষ্ট তাতে প্রক্সি চালাই।

: ভাবছি পড়া ছেড়ে দেব। ভাল লাগছে না।

: সে কি! পরশু না আমায় বললে জীবনে কি করবে একেবারে স্থির করে ফেলেছ? শেষপর্যন্ত পড়ে চাকরী করবে?

: বলেছিলাম না কি? করব তাই— মাঝে মাঝে কেন জানি ভারি বিশ্রী লাগে।

কোন দিন খুব ভোরে আসত, শুধু মুখে চোখে জল দিয়ে, চুলটুল না আঁচড়েই।

মানুষ কিসে সুখী হয় বলত? কাল ক'টা মেয়ের সঙ্গে একটা বস্তিতে গিয়েছিলাম। ওরা মাঝে মাঝে যায়, রেগুলার ওয়ার্ক করে। আমার কাল সখ হল, দেখে আসি। উঃ, কি ভয়ানক অবস্থায় থাকে বস্তির মেয়েগুলি! অথচ, ওদের তো খুব অসুখী মনে হল না? কাল অনেক রাত পর্যন্ত ভেবেছি।

বলে হাসত, রাত জেগে ভেবেছি আর ভোরে উঠেই তোমার কাছে ছুটে এসেছি। তুমি মস্ত পণ্ডিত মানুষ, বয়সে অনেক বড়—

হাসি থামিয়ে বলত, ছুতো ভেবো না কিন্তু। তোমার কাছে বুঝতে আসি নি, তুমি কি ভাব শুধু সেটুকু শুনতে এসেছি।

: বস্তিতে পুরুষ দ্যাখো নি? তাদের সুখী না অসুখী মনে হল?

: পুরুষ? খেয়াল করি নি!

কোনদিন রাত নটা দশটার সময় বাড়ী ফিরে দেখতাম, সে মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে।

বৌদি বলতেন, বেচারা সাতটা থেকে তোমার জন্য বসে আছে ঠাকুরপো।

পড়ার ঘরে এসে মানসী বলত: একটা কথা বলতে এসেছিলাম। ভেবে দেখলাম, থাকগে, দরকার নেই।

: এতক্ষণ বসে আছ, বলেই ফেল না কথাটা।

: বলে আর কি হবে? যাব না ঠিক করেছি।

: কোথায় যাবে না?

: বাবা মা কাল পাটনা যাবেন। ওই সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসতে যাব ভেবে বলতে এসেছিলাম, তুমিও যদি যেতে পার। তারপর ভেবে দেখলাম, পাটনায় আবার কি বেড়াতে যাব! পরে অন্য কোথাও যাওয়া যাবে।

এই অনিশ্চয়তা, ক্ষণে ক্ষণে মনের এই দিক্ পরিবর্তন, এটা অবশ্য আমার সঙ্গে পরিচয় হবার আগে এতটা স্পষ্ট ছিল না। আমার সঙ্গে মেলামেশা ঘনিষ্ঠতার পরেই তার এই অস্থিরতা বেড়েছে।

আমি যদি ভাবুক কবি হতাম তাহলে পরমানন্দে এর মধ্যে আবিষ্কার করতাম প্রেম! বুঝে নিতাম, আমায় ভালবেসে ফেলার জন্যই মানসীর এই ছটফটানি।

ভালবাসা যেন মেয়েদের চঞ্চল অস্থিরচিত্ত করে দেয়! প্রেমের গুরুভার হৃদয়ে চাপলে বরং চপলমতি দিশেহারা মেয়ে শান্ত হয়, দিশে ফিরে পায়।

শুধু মানসীর অস্থিরতা কেন, সব কিছুরই মনের মত

মানে করার অভ্যাস থাকলে আরও একটা লক্ষণ দেখে অহঙ্কারে ফুলে উঠতে পারতাম অনায়াসে।

আমি একবার মানসীর কাছে গেলে মানসী যেচে পাঁচবার আমার কাছে আসে।

এর সহজ মানে কি দাঁড়াত না যে, তাকে আমি এমনভাবেই জয় করেছিলাম, এমনি সে উন্মাদিনী হয়ে উঠেছিল আমার জন্য যে, মেয়েদের একেবারে স্বতঃসিদ্ধ প্রাকৃতিক ধর্মকে পর্যন্ত সে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, মেয়ে হয়েও উপযাচিকা হতে তার বাধছিল না— একবার নয়, বারংবার!

জগতের সব চেয়ে বোকা মেয়েও আপনা থেকে জানে যে এতে নিজেকে সস্তা করা ছাড়া বিন্দুমাত্র লাভ নেই। মানসীকে তার চেয়েও বেশী বোকা ভাবব কোন বুদ্ধিতে?

কিন্তু চোখ বুজে ভুল বুঝে খুশী থাকার ধাত আমার নয়। নিজের সঙ্গে ফাঁকির খেলা আমার সয় না। এটা আমি ঠিকমতই টের পেয়েছি যে, বারবার যেচে এভাবে আমার কাছে ছুটে ছুটে এলে আমি কিছু ভাবতে পারি এটা মানসী খেয়ালও করে নি।

তার অস্থিরতার যে কারণ, ঘন ঘন আমার কাছে আসবার কারণও সেটাই। এসব আমাকে কেন্দ্র করে নয়, আমি উপলক্ষ মাত্র। তার ভিতরে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন এসেছে, নিজের এলোমেলো ছড়ানো চেতনাকে একটা সুসম্বদ্ধ সুগঠিত রূপ দেবার জন্য সে হয়েছে ব্যাকুল। নিজের

উদ্দেশ্যহীন শৃঙ্খলাহীন মতিগতিকে সে অতিক্রম করে যেতে চায়।

নিজেকে সে খুঁজে পায় না। এতদিন বিশেষ কোন জরুরী প্রয়োজন দেখা দেয় নি নিজেকে খুঁজে পাবার। এবার সে উঠে পড়ে লেগেছে নিজেকে অন্ততঃ মোটামুটি গুছিয়ে নিতে— যাতে এটুকু তার পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে যে অসম্পূর্ণ হই খণ্ডিত হই আর যেমন হই, আমি এইরকম।

আমার জন্যই অবশ্য এটা ঘটেছে, আমার প্রভাবে। কিন্তু একটা মানুষের প্রভাবে আরেকটা মানুষের বদলে যাবার প্রক্রিয়া তো প্রেম নয়!

আমি জানতাম, মানসীও পরে আমায় বলেছে, আমার কাছে বিশেষভাবে কোন্ দিক দিয়ে তার জুটেছিল পরম আশ্বাস, অভাবনীয় স্বস্তি। কোন্ বিশ্বাস আমাকে তার সব চেয়ে বড় বন্ধু করেছিল।

আমি প্রেমাতুর নই, সব সময় তার ওঠাবসা চলা ফেরা কথা আর কাজে আমি শুধু মানে খুঁজি নি যে সে আমার প্রেমে পড়ে গেছে।

দুটো মিষ্টি কথা, একটু প্রীতির হাসি, একটি সদয় চাউনি, শুধু এটুকু থেকেই চেনা আধ-চেনা এমনকি প্রায়-অচেনা ছেলে অমনি বুঝে নেয় মানসীর কি হয়েছে! সত্যই যেন প্রেমের ফাঁদপাতা রয়েছে ভুবনে— সব সময় সাবধানে হিসাব করে কথাটি পর্যন্ত না কইলে ধরা পড়ে যেতে হবে।

: স্বাধীনভাবে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার সুখ না ছাই, এ যেন অভিশাপ! তুমি বুঝবে না, মেয়ে হলে বুঝতে। সবাই যেন ওৎ পেতে আছে, সব সময় সকলের সঙ্গে হিসেব করে চলা, এতটুকু এদিক ওদিক হলে আর রক্ষা নেই। একজনের সঙ্গে মিশতে ভাল লাগে বলে একটু ঢিল দিয়েছ কি প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে! একেবারে উল্টো ব্যবহার করে ঘা দিয়ে অপমান করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, না বন্ধু, তুমি ভুল করেছ!

মানসী নিশ্বাস ফেলেছিল : তা ছাড়াও বদনাম। মেয়েটা ভারি ইয়ে, ছেলে নিয়ে খেলা করে, বাঁদর নাচায়।

: দোষ কি শুধু ছেলেদের? ছেলেরা কিন্তু ঠিক এই নালিশ করে। কোন মেয়ের সঙ্গে একটু ভাল করে মিশলেই—

: সমাজটাই পচে গেছে, না?

আমি হেসেছিলাম। ওই বয়সে সমাজবিদ হয়ে পড়ি নি— কিন্তু সহজ বুদ্ধি বজায় রাখলে ওই বয়সেও সমাজ পচে যাবার কথা শুনে হাসা যায়। পচে হেজে গেছে আমাদের সমাজ— বুড়োদের মুখে আর তরুণদের সাহিত্যে এ আর্তনাদ শুনে সহজ বুদ্ধি বজায় রাখা যদিও খুব সহজ নয়।

: সমাজ পচে গিয়ে থাকলে আমরা বেঁচে আছি কি করে? মানুষ কি তা হলে বাঁচে? পচন ধরাবার চেষ্টা চলেছে বহুকাল ধরে— আমরা দুশো বছর পরাধীন! গলদ জমেছে অনেক,

সেকেলে একেলে এদেশী সেদেশী অনেক কিছু মিলে উদ্ভট খিচুড়ি বনেছে— কিন্তু সমাজ পচে নি। তুমি আপশোষ করছ, ব্যাপারটা আপশোষ করার মতই। কিন্তু অত হতাশ হবার কিছু নেই। বাস্তব অবস্থা যেমন তারই সঙ্গে খাপ খাইয়ে ছেলেমেয়েদের মেলামেশার রীতিনীতি রকমফের হয়েছে— দু'চারজনের রুচি আর পছন্দ নিয়ে তো এসব গড়ে ওঠে না। সাঁওতালদের সমাজে মেলামেশা একরকম, তোমার আমার সমাজে আরেকরকম। ভাল হোক মন্দ হোক, তোমার আমার পছন্দ হোক বা না হোক— সবাই আমরা যে অবস্থায় আছি তাতে যেরকম হওয়া দরকার ছিল তাই হয়েছে!

মানসী চুপ করে মন দিয়ে কথাগুলি শুনেছিল। গুরুজন নই, অধ্যাপক পণ্ডিত নই, প্রায় সমবয়সী একজন কবি। তার এই সহজ শ্রদ্ধার দাম যে কতখানি ছিল তখন ভাল বুঝি নি। অনায়াসে নিজের প্রাপ্য বলে গ্রহণ করেছি।

যে ভাবে লিখলাম এরকম ছাঁকা ভাবে অবশ্য কথাগুলি মানসীকে বলি নি। সাধারণ চলতি আলাপের কথায় ছেড়ে ছেড়ে কেটে কেটে অনেকক্ষণ ধরে বলেছি।

: প্রাণ খুলে অবাধে মিশতে চাও? চাও যে কেউ ভুল বুঝবে না? দেশটা পরাধীন— সেই পরাধীন দেশে তুমি পরাধীনা মেয়ে! কত শিক্ষা পেয়েছ তোমরা? কত সংস্কার

কাটিয়েছ? তোমাদের মালিক আমরা পুরুষরাই রয়ে গেছি অশিক্ষিত, সংস্কারে ভরা।

মানসী বলেছিল, এসব যদি বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়েই হয়েছে— এত অসহ্য ঠেকে কেন? আমরাও তো সেই বাস্তব অবস্থায় তৈরী মানুষ।

: আমরা অবস্থাটা মানতে চাই না। মুক্তি চাই। পরিবর্তন চাই।

: ঠিক! তুমি ঠিক বলেছ!

চার

লোকে বলবে, তুমি কবিই বটে। এবং তুমি যে বস্তুবাদী কবি তাতেই বা সন্দেহ কি? এত বড় জগৎ পড়ে আছে, জীবনের এত বিচিত্র দিক, মানুষের এত ব্যাপক জীবন-সংগ্রাম— এতক্ষণ ধরে তুমি শোনালে শুধু তোমার মানসীর কথা!

তাও প্রেম সুরু হবার আগেকার কথাটুকু!

আমি বলব, মিছে কথা! আমি জীবনসংগ্রামের কথাই বলেছি। সংগ্রাম বিমুখ এক মানসীর জীবনসংগ্রামের একটা বড় দিকের গোড়াপত্তনের কথা।

সেইজন্যই এত করে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে বহুদিন পর্যন্ত কেন প্রেমের কথা আমাদের মনেও আসে নি। মানসী যে আমায় ব্যাকুলভাবে আঁকড়ে ধরেছে সেটা কেন প্রেমের জন্য নয়— তার মোহমুক্তির লড়ায়ের প্রয়োজনে!

আমি জীবনসংগ্রামকে মানি— জীবন আমার কাছে ছন্দিত স্পন্দিত বিকাশধর্মী সার্থকতা। এ সার্থকতার জন্য শত দুঃখ দৈন্য রোগ শোক ব্যর্থতা হতাশার মধ্যেও মানুষের লড়াই আছে— পলায়ন নেই। আমি আনন্দ আর সুন্দরের উপাসক— তাই আনন্দের ভেজাল মেশানো নিরানন্দ,

সুন্দরের মুখোস পরা অসুন্দর, সত্য ও শিবের মার্কা মারা মিথ্যা ও ফাঁকি আর ভীরুতাকে প্রশ্রয় দিতে আমি নারাজ।

আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে আমারই ব্যক্তিত্বের সংঘাতে তাই মানসী মিথ্যা ও ফাঁকির বেড়াজাল ছিঁড়ে মুক্তি আর মনুষ্যত্বের জন্য লড়াই সুরু করেছে।

প্রায় দু'বছর আমাকে গুরু করে শিষ্যা হয়ে থেকেছে। একদিনের জন্য প্রেমিকের আদর চায় নি আমার কাছে।

জগতে মানসীর মত মেয়ে কি আর নেই? শুধু এই একজন আমার সংস্পর্শে এসে জীবন থেকে জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলে খাঁটি হতে চাইল?

তার আগে আর পরে আরও অনেক মেয়ে কমবেশী নবজীবনের প্রেরণা পেয়েছে আমার কাছে। মানসী কেন বিশেষভাবে আমার কাছে প্রশ্রয় পেল তার কারণ আগেই বলেছি।

এমন সুস্থ সুন্দর দেহশ্রী, এমন সতেজ সজীব রূপলাবণ্য আগে আর আমি দেখি নি।

বৌদি বলেন, ঠাকুরপো, একটা কথা বলি। রাগ করো না, তোমার ভালর জন্যই বলা।

: রাগ করব কেন? তুমি কি আমার ভাল ছেড়ে মন্দ চাও?

বৌদি গম্ভীর মুখে বলেন, আর যাই কর, মেয়ে নিয়ে মাতামাতির বয়স তোমার এটা নয় ঠাকুরপো। একটু আধটু

মেলামেশা করলে সে আলাদা কথা। এত ঘনিষ্ঠতা করলে ভবিষ্যতের কথা ভাববে কখন ?

: আমিও তাই ভাবছিলাম।

বৌদি খুশী হয়ে বলেন, ভাবছিলে ? লক্ষ্মী ছেলে ! এবার তাহলে ঘনিষ্ঠতা একটু কমিয়ে দাও। বয়েসের দিক দিয়ে ভারি বেমানান হবে, বয়েস তো আরও বেড়ে যাবে তুমি মানুষ হতে হতে। তবু, আমি সে কথা ধরছি না। ওকে তুমি চাও, বেশ, ওকেই তুমি ঘরে এনো। কিন্তু তার ব্যবস্থা তো করতে হবে ? পাশটাশ করে বেশ একটা ভালমত চাকরী তো জোটাতে হবে ? নইলে যে সব স্বপ্নই থেকে যাবে ভাই !

: ও বাবা ! তোমরা এতসব ভেবেছ ?

: ভাবব না ? তোমার ভালমন্দ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকব ? মা, উনি, মায়াদি আমি— আমরা চারজনে ক'দিন ধরে আলোচনা করেছি। আমরা কি চিন্তায় পড়েছি, তুমি ধারণা করতে পারবে না। তোমায় তো জানি আমরা। জোর করতে গেলে, শাসন করতে গেলে তুমি আরও বিগড়ে যাবে। তোমায় বুঝিয়ে বললে বুঝতে পারবে এটুকু আমরা আশা করছি।

: তুমি তাই বুঝিয়ে দিতে এসেছ ?

বৌদি খানিক চুপ করে থেকে বলেন, হ্যাঁ ভাই, বুঝিয়ে দিতে এসেছি। যতই হোক তুমি তো ছেলে মানুষ, সংসারের হালচাল সব তো তোমার জানা নেই। কয়েকটা সোজা স্পষ্ট

কথা বলব তোমায়। তাতে কি দোষ আছে কিছু?

বৌদি এম. এ পাশ করে ছ'বছর মাষ্টারি করেছিলেন। আমার ভগ্নী লতিকাকে প্রাইভেট পড়াতে এসে দাদার সঙ্গে তার পরিচয় ও বিয়ে হয়। বৌদি নিজের বয়স যত বলেছিলেন এবং এখনও বলে থাকেন, সেটা মেনে নিলে অবশ্য দাদার সঙ্গে তার বয়সটা খুব মানানসই হয়— সেই তুলনায় মানসী ও আমার বয়স নিতান্তই বেমানান। কিন্তু এম. এ পাশ করে ছ'বছর মাষ্টারি করে— ক্লান্তি আর হতাশার যে ছাপ এখনো তার মুখ থেকে মুছে যায় নি সেটা কি ওই বয়সে কোন মেয়ে মুখে আমদানী করতে পারে? ছ'সাত বছর হয়ে গেছে, আজও বৌদি যেন বাসর ঘরের সেই নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ফেলছেন মনে মনে, মাগো, বাঁচলাম!

আমি বলি, বৌদি, আমার একটু পেট খারাপ হলে তুমি এমন ব্যস্ত হয়ে পড় যেন আমার কলেরা হয়েছে। তোমার কথা মন দিয়ে শুনব না আমি? বুঝবার চেষ্টা করব না?

নিশ্বাস ফেলে আবার বলি, তবে জানই তো, অল্প বয়সে বড় বেশী পেকে গেছি। তাই সোজাসুজি স্পষ্ট করে বল।

: সোজাসুজিই বলছি। তুমি তো জানো, মানসীর বাবা নাম করা ডাক্তার, অনেক টাকা করেছেন। ওর এক ভাই আই. সি. এস। আরেক ভাই নাকি ব্যবসা করে—

: জেলে যেতে বসেছিল।

: ওমা, তাই নাকি?

: যেতে বসেছিল, যায় নি। মানসী আমায় বলেছে। বাপ ভাই সামলে নিয়ে চেপে দিয়েছে ব্যাপারটা। মানসী বলেছিল, ছোরদার ছু'চার বছর জেল হলে ও ভারি খুশী হত।

বৌদি হেসে বলেন, ওটা তোমারি শেখানো বুলি, তোমায় খুশী করার জন্য বলেছে।

আমি একটা সিগারেট ধরাই।

বৌদি গম্ভীর হয়ে বলেন, রোজ এক প্যাকেট সিগ্রেট খাও। কোনদিন দেড় প্যাকেটও হয়। সাড়ে সাত আনা না? মাসে কত পড়ে হিসেব করেছ? কলেজের মাইনে, বই, ট্রামের মান্থলি—

: আমি তো বাঁধা হিসেবের বেশী টাকা চাই না বৌদি!

: চাওনা কিন্তু খরচ তো কর!

: রোজগার করে খরচ করি। লিখে ছু'দশ টাকা পাই।

: অপচয় কর কেন?

: তোমরা অপচয়ের টাকা দেবে না, কি করি!

বৌদি মাথা নেড়ে বলেন, যাক্ যাক্, ঝগড়া করতে আসি নি ভাই। ওসব কথা পরে হবে। যা বলছিলাম, তাই বলি। মানসী নয় তোমার জন্য পাগল, কিন্তু তুমি ওকে বিয়ে করতে চাইলে কি হবে ভেবে দেখেছ? ওর বাপ ভাই হেসে উড়িয়ে দেবে কথাটা। কি আছে তোমার? কি দেখে মানসীকে তোমার হাতে দেবে? এসব কথা শুনতে খুব খারাপ লাগে, কিন্তু কি করবে, এই হল সংসারের নিয়ম।

ছেলেখেলায় সময় নষ্ট করছ, এতে কোন লাভ নেই। তার চেয়ে উঠে পড়ে লাগো না, নিজের দিকটা গুছিয়ে নাও? ক'বছর বাদে যাতে নিজের জোরে দাবী করতে পার, কারো যাতে বাধা দেবার সাধ্য না থাকে? তাই কি ভালো নয়? আমাদের মুখ চাইতে বলছি না, তোমার সুখেই আমাদের সুখ। মানসীর জন্যেই তুমি মেলামেশা কমিয়ে দাও— ওকে বুঝিয়ে বলো, আজ যে সময় নষ্ট করছ সেটা কাজে লাগালে পরে তোমাদেরি ভাল হবে।

সহজ সত্য কথা। সংসারের সেই চিরদিনের নিরেট নীতিকথা, সব ক্ষেত্রে লাগসই সদুপদেশ। হে তরুণ, যাই তোমার কামনা হোক, লক্ষ্য হোক— যশ চাও, অর্থ চাও, রাজকন্যাকে চাও বা জ্ঞান চাও, ভক্তি চাও বা ঈশ্বরকে চাও— শুধু সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মনপ্রাণ সময় শক্তি সব কিছু লাগাও। খাঁটি যুক্তি। কে অস্বীকার করবে?

কিন্তু মুস্কিল এই যে, এসব বাস্তব নীতিকে মানুষ একপেশে করে নিয়েছে— উদ্দেশ্যের চেয়ে উদ্দেশ্য সাধনের পথ আর প্রচেষ্টাকেই করেছে প্রধান। খাটো কাপড়ের মত তাই নীতির আঁচল এদিকে টানলে ওদিকে কুলোয় না।

মানসীকে পাওয়ার কথা তখন পর্যন্ত আমার মনে জাগে নি। তাকে পাওয়ার বাস্তব বাধা অসুবিধার হিসাবও কষি নি, সে সব বাধা কাটাবার উপায়ও খুঁজি নি। কিন্তু ভেবে দেখলাম, বৌদির ভুলটা দেখিয়ে দেওয়া উচিত।

সংসারে সব সময় সব অবস্থায় ধরাবাঁধা নিয়মনীতি কলের মত খাটিয়ে গেলেই চলে না! সে চেষ্টা চলে বলেই সংসারে নিয়মতান্ত্রিক মানুষদের ঝঞ্ঝাটের সীমা নেই।

আমি বলি, বৌদি, সে তো বুঝলাম। কিন্তু কবে আমি মানুষ হব সেই আশায় মানসী হাঁ করে বসে থাকবে? আমি নয় দেখাশোনা কমিয়ে দিলাম, কোমর বেঁধে মানুষ হতে লেগে গেলাম। এর মধ্যে মানসী যদি আরেকজনের হয়ে যায়, আমার ক্ষতিপূরণ করবে কে?

বৌদি বড় বড় চোখ করে তাকান।

আমি হেসে বলি, কিসে এই ক্ষতিপূরণ হয় আমি জানি না। তোমার জানা আছে? তুমি পারবে তো ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে? যদি পার, কথা দাও, আমি তোমার কথামত চলব।

: কী সর্বনাশ! তুমি কি এখনি ওকে বিয়ে করার কথা ভাবছ? পরীক্ষা দিতে দিতে? আমাদের অমতে, ওর বাপ-ভায়ের অমতে বিয়ে করবে?

আমি হাসিমুখেই মাথা নেড়ে বলি, ওসব ভাবনাও আমার মাথায় ঢোকে নি। তোমরাই পরামর্শ করে আমায় নিয়ে একটা সমস্যা দাঁড় করিয়েছ। সমস্যাটা যদি সত্যিও হয়, তোমার উপদেশটা কেমন একপেশে আমি তাই দেখালাম। তুমি বলছ মানসীর জন্যই আমার আগে মানুষ হওয়া উচিত— আমি জিজ্ঞাসা করছি, মানুষ হতে

গেলে মানসীকে যদি হারাতে হয়? তুমি জবাব দিতে পারলে না। মিছে মনগড়া সমস্যা নিয়ে কেন ভেবে মরছ?

বৌদির মুখ দুশ্চিন্তায় কালো দেখায়। তার সুপরামর্শের ফাঁকিটা দেখিয়ে দিতে গিয়ে আমি শুধু তার মধ্যে নতুন আশঙ্কা জাগিয়ে দিয়েছি মাত্র!

: কী সর্বনাশের কথা! তোমরা সব ঠিক করে ফেলেছ নাকি?

: কি মুস্কিল! আমরা কিছুই ঠিক করি নি।

কিন্তু কে কার কথা শোনে!

কেউ আর কিছু বলে না। মেঘভরা বর্ষার আকাশের মত থমথমে মুখ নিয়ে মা করুণ চোখে তাকান। দিদির চোখে মুখে উদ্যত বজ্রের মত ভৎ´সনা দেখতে পাই। চির-দিনের মত বাবার চিবুকে নিদারুণ দুশ্চিন্তার হাত বুলানো চলতে থাকে। দাদা আপিস কামাই করেন।

অতিমাত্রায় ব্যস্ত আর বিব্রত হয়ে থাকেন বৌদি। এ ব্যাপারে তিনি হাল ধরেছেন, সকলকে সামলে চলেন। তাকে ডিঙ্গিয়ে কেউ পাছে আমাকে কিছু বলতে গিয়ে সব বিগড়ে দেয়।

কি নিদারুণ বিপদের সম্ভাবনা যে ঘনিয়েছে পরিবারে! বাড়ীর অল্পবয়সী কলেজের ছাত্র একটি ছেলে সকলের অমতে

একজন ধনী প্রতিপত্তিশালী ডাক্তারের মেয়েকে, একজন মস্ত সরকারী অফিসারের বোনকে ফুসলে নিতে চলেছে বিয়ের আইনের সুযোগে। কে জানে কোথায় গড়াবে ব্যাপার ?

আমিও চুপ করে থাকি। মজা দেখতে নয়, ব্যাপার বুঝতে। আমিও থ' বনে গেছি। কিসের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের এই পরিবারটি ? একটি ছেলের একটা নিয়মভঙ্গ একটা অবাধ্যতায় যে ভিত্তি টলে যায়, মনে হয় যেন ভাঙনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সমস্ত পরিবারটি ?

তেমন কিছু আর্থিক অনটন তো নেই, অথবা ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা ? অনেক সাধ অনেক আশা অপূর্ণ থেকে যায়, অনেক দূরাশা অনেক স্বপ্ন চিরব্যর্থতার জ্বালা হয়ে থাকে। কিন্তু মানসীকে আমার বিয়ে করাটা এত বড় একটা পারিবারিক বিপদ হয়ে দাঁড়ায় কি করে ? পরিবারটিকে জীইয়ে রাখার প্রত্যাশা তো আমার কাছে এদের নেই !

ধীরে ধীরে অলোকদের বাড়ী গিয়ে একটু বসি।

মোড়ের কাছাকাছি ধনঞ্জয়বাবুর পুরাণো গ্যারাজটা ভাড়া নিয়ে মাস ছয়েক বাস করছে অলোকরা— সমস্ত পরিবারটি।

একটি উৎখাত হওয়া পরিবার। অলোকের বাবা রামেশ্বরবাবু ওকালতি গুটিয়ে যেটুকু পেরেছেন সেটুকু অর্থসম্পদ কুড়িয়ে সপরিবারে পালিয়ে এসেছেন।

অলোক মেসে থেকে কলকাতায় পড়ছিল। এখন আর পড়ে না। চাকরী খুঁজছে।

অলোকের মা বলেন, এসো বাবা, বোসো।

আলেয়া এলোচুল গুটিয়ে নিতে নিতে বলে, আপনার যায়গাতেই বসুন, গদি পাতাই আছে।

এই একখানা মোটে ঘর— গ্যারাজ ছিল, সামান্য অদল বদল হয়ে ঘরে পরিণত হয়েছে। রাস্তার দিকের প্রকাণ্ড হাঁ করা দরজাটা গেঁথে ফেলে পাশের সরু প্যাসেজের দিকে বসানো হয়েছে সাধারণ দরজা। প্যাসেজটাই ঘিরে ঢেকে দু'টি অংশে ভাগ করে করা হয়েছে রান্নাঘর আর কল ঘর। লম্বাটে রান্না ঘরটুকুতে একজন কোনরকমে বসতে পারে।

এক কামরাওয়ালা বাড়ী হিসেবে এটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে।

এই একখানা ঘরে সকলে ওঠে বসে খায়দায় ঘুমায়— সকলে! বেশী রাত্রে কখনো আসি নি, কি কৌশলে বিছানা করা হয় জানি না। কল্পনা করে কুলকিনারা পাওয়া দায়।

সাতজন মানুষ! রামেশ্বরবাবু, অলোকের মা, অলোক, আলেয়া, আলেয়ার ছোটবোন মলয়া, তারও ছোট ভাই অশোক— এবং আলেয়ার বর নিখিল।

তাদের বিয়ে হয়েছে বছর চারেক। আমিও রেলস্টীমারে চেপে অলোকের প্রথম বোনের বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম।

নিখিলের কিছু রোজগার আছে। ভোরে সে বেরিয়ে যায়, রাত ন'টায় বাড়ী ফেরে। শনি রবি নেই, ছুটি নেই। ভোরে হেঁটে বেরিয়ে বাড়ী ফেরার পথে মাঝে মাঝে কখনো আমার সঙ্গে দেখা হয়। বয়স হবে ছাব্বিশ সাতাশ কিন্তু ছোটখাটো রোগা চেহারা আর অপরিণত মুখের ভাবের জন্য আরও ছোট মনে হয়। মুখখানা শুকনো। শান্ত লাজুক প্রকৃতি। নিজে থেকে কথা কয় না।

আমি যদি বলি, এত ভোরে বেরিয়েছেন ?

থেমে দাঁড়িয়ে মৃদু একটু হাসে, হ্যাঁ, উপায় কি।

: আপনার আপিসটা কোথায় ?

: ঠিক আপিসে কাজ নয়। এখানে ওখানে ঘুরে—

থেমে গিয়ে নীরবে চেয়ে থাকে। সেটা খুব সহজ প্রশ্ন এবং ঘোষণা : আমার ঘরের খবর আরও কিছু জানতে চান ? অমি আর একটি কথাও বলব না !

একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলে ধরায়। নিজের মনেই বলে, সুবিধে হচ্ছে না, এ কাজটা ছেড়ে দেব ভাবছি। বড় খাটুনি।

দিনের বেলা ঘরের কোণে লেপতোষক জমা থাকে। তার উপর গদিয়ান হয়ে বসলে আরাম মন্দ হয় না। আমি চটের আসনটা টেনে নিয়ে মেজেতে পেতে বসি।

চারিদিকে তাকিয়ে নিখিলের কথাটা মনে পড়ে।

সত্যই এদের বড় খাটুনি। সকাল থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত তার খাটুনি বাইরে, তারপর এই ঘরটুকুতে শ্বশুর শাশুড়ী শালা শালীদের সঙ্গে বৌ নিয়ে রাত্রিযাপনের অমানুষিক খাটুনি।

এদের খাটুনিও কি কম? এতটুকু ঘরে মানুষের যেখানে নড়াচড়াটা পর্যন্ত অসুবিধার সঙ্গে যুদ্ধের পরিশ্রম, সারাটা দিন রাত সেখানে কাটানো?

সকলে কি ভাবে যেন চুপ হয়ে গেছে। রামেশ্বর সার্ট গায়ে দিয়ে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বোঝা যায়, এমন একটা সাংসারিক কথার মধ্যে আমি এসে পড়েছি আমার সামনে যে কথার জের টানা কঠিন।

কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। কারণ একটু ইতস্ততঃ করে অলোকের মা রামেশ্বরকে বলেন, তাই কর তবে। চাল আর তরকারীই আনো। শুধু চাল চিবিয়ে তো খাওয়া যাবে না।

রামেশ্বর বলেন, অলোকের জন্য আর খানিকটা দেখব?

: কি দরকার? পাবে কিনা ঠিক তো নেই। বেলা কম হয় নি।

আলেয়া প্রায় ঝাঁকি দিয়ে মাথা তুলে আমার দিকে তাকায়। সোজাসুজি আমাকে জানিয়ে দেয় ব্যাপারটা কি। বলে, সের দুই চাল কিনলে তরকারীর পয়সা থাকে না। চাল আর তরকারী ভাগাভাগি করে কিনলে শুধু আজকের

দিনটি চলবে। তা, সেটাই ভালো ব্যবস্থা, না, কি বলেন? শুধু চাল চিবিয়ে খাব কি করে! আজ তো চলুক, কাল যা হবার হবে।

রামেশ্বর তীব্র দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকায়। কিন্তু সে, দৃষ্টিতে তীব্রতা আছে ভর্ৎসনা নেই— মানসীকে বিয়ে করতে চাই বলে আমার বাড়ীতে সকলের চোখে যে ভর্ৎসনা ফেটে পড়তে দেখে এসেছি।

মলয়া বলে, দিদির মুখে আটক নেই!

আলেয়া বলে, খেতে পাই না, মুখে আবার মানের আটক!

রামেশ্বর মলয়াকে ধমক দিয়ে বলেন, তোর অত কথা কেন? দে, থলি আর ন্যাকড়াটা দে।

রামেশ্বর বেরিয়ে যান। আমার দিকে ফিরেও তাকান না।

অলোকের মা বলেন, কপালে আরও অনেক ভোগ আছে। বলে তিনিও বেরিয়ে যাবার উপক্রম করেন।

আলেয়া বলে, কোথা যাচ্ছ মা?

: ঘুরে আসি।

তিনি চলে গেলে আলেয়া আমায় বলে, বাড়ীতে মন টেঁকে না। দিনে দশবার বেরিয়ে যায়। পাড়া বেড়ায় না রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় কে জানে! ট্রাম বাসের পয়সা যোগাতে পারলেই কালীঘাট নয় দক্ষিণেশ্বর। আমাদের সবার চেয়ে মার ছটফটানি বেশী।

: সে তো হবেই। কেউ একেবারে মুষড়ে পড়েন, কেউ অস্থির হন। সারাজীবন একভাবে সংসার করলেন, এখন শেষ বয়সে—

: সংসারটা ভেঙ্গে পড়ছে। কিন্তু সত্যি সত্যি ভাঙ্গছে কই? তাহলে তো বেঁচে যেতাম!

বোধ হয় দমও নেয় না, একনিশ্বাসে বলে, ক'টা টাকা ধার দেবেন?

: গোটা চারেক দিতে পারি।

: তাই দিন। আমার চাওয়া দরকার আমি চাইলাম, আপনার খুশী হলে দিতেন, খুশী না হলে দিতেন না। এবার ইচ্ছা হয় আসবেন, নইলে আসবেন না। আমার না হলে নয়, কেন ধার চাইব না!

: নিশ্চয়, কেন চাইবেন না? কিন্তু এদিকে আবার কেঁদেও ফেললেন দেখছি!

: একটু আধটু না কাঁদলে বাঁচব কেন?

অলোক আর সে পিঠোপিঠি ভাইবোন। মানসীর সঙ্গে বয়সের যদি তফাৎ হয় তো বড় জোর এক বছর কম বেশী হবে। সে তো মেয়ে, তার তো দায়িত্ব নেই, তবু কেন সে অসহায় বাপ মা ভাইবোনদের আঁকড়ে পড়ে আছে, স্বামীর সঙ্গে কোমর বেঁধে লেগেছে অচল সংসার চালু রাখতে?

তারা ছুটি প্রাণী, যাই যোগার করুক নিখিল, ছু'জনে দূরে

সরে গেলে অনেক ভালভাবে অনেক নিশ্চিন্তে তারা দিন কাটাতে পারে।

আলেয়ার না হয় বাপ মা ভাই বোন, নিখিল কেন এটা মেনে নিয়েছে? এ কোন আদর্শবাদ এদের? এমনিতেই দুঃসাধ্য জীবন-সংগ্রাম। ছেলের সঙ্গে মা বাপের, ভাইয়ের সঙ্গে নিজের ভাইয়ের সম্পর্ক গুঁড়ো করে দিচ্ছে, স্বামী স্ত্রী পর হয়ে ঘর ভেঙ্গে পড়ছে, এরা দু'জন কেন ঘাড় পেতে নিয়েছে এই বোঝা?

বিয়ের পরেই লিখিলকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তার ভাই, সে কাহিনী অলোকের কাছে শুনেছি। বড় পরিবার ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়ে আর খণ্ড খণ্ড ছোট পরিবার পথের ধারে চুরমার হতে নেমে এসে যে বিষাক্ত তিক্ততা সৃষ্টি হচ্ছে চারিদিকে নিখিল তো তার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয় নি!

শুধু মাস কয়েক সে বেকার অবস্থায় রামেশ্বরের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই থেকে রামেশ্বরের কাছেই সে বরাবর আছে কিন্তু তার উপর নির্ভর করে থাকে নি একটি দিনের জন্যেও। যেমন হোক উপার্জন করেছে। বেকারির ক'মাস শ্বশুর ভাত দিয়েছিল এই কৃতজ্ঞতাই কি বুকে পুষে রেখেছে নিখিল— আর আলেয়া?

ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ক'পা এগোতেই মলয়া এসে পাকড়াও করে।

: কেমন আমায় ধমক দিল দেখলেন তো? আমার মাকড়ি বেচে দিয়েছে কি না, আমিই তাই ধমক খাই।

কিশোরী মেয়ের দু'টি চোখে কি হিংসা আর ক্ষোভ!

: ছেলেমানুষ গয়না দিয়ে কি করবে?

: আমি ছেলেমানুষ নই। শাড়ী পরতে দেয় না, নইলে দেখতেন—

আমি মৃদু হেসে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, তোমায় শাড়ীও পরতে দেবে, গয়নাও দেবে। ছেলেমানুষ যখন নও, ভাবনা কি? তাড়াতাড়ি বিয়ে হবে।

মলয়ার দু'চোখে বিদ্যুতের ঝলক খেলে যায়।

: ছাই হবে। দু'দিন বাদে ঝি খাটতে পাঠাবে আমায়, নয় বিক্রি করে দেবে!

মলয়াও দম না ফেলে একনিশ্বাসে যোগ দেয়, আমায় একটা টাকা দিন। আমি কি ভেসে এসেছি?

: সঙ্গে তো আর টাকা নেই।

: চলুন আপনার বাড়ী যাব।

টাকাটা তাকে আমি দিই। আমি জানি এভাবে তাকে একটা টাকা দেওয়া বা না দেওয়াতে কিছুই আসে যায় না। এটা ভাল কাজও নয় মন্দ কাজও নয়। একটা টাকা না দিতে চেয়ে আমি কি ঠেকাতে পারব চারিদিকের দুর্নিবার শক্তি তাকে যে বিকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে?

এও আমি জানি যে টাকাটা নিয়ে সে খাবার কিনে খাবে— যাবার পথেই খাবে। আজ খাবে কয়েক আনার, বাকী পয়সা লুকিয়ে জমিয়ে রাখবে কাল পরশুর জন্য।

টাকাটা হাতে পেয়ে খুসী হয়ে মলয়া আমার গা ঘেঁষে আসে। মুচকি মুচকি হাসে।

সে টের পায় না আমার হৃদয় মনে কি আলোড়ন উঠেছে। কী প্রচণ্ড ঘৃণায় আমায় সমস্ত সত্তা ধিক্কার দিতে উদ্যত হয়ে উঠেছে দেবতারূপী সেই জীবনদানবকে, গোপন নখ দাঁতের সঙ্গে এই নিষ্পাপ নির্দোষ কিশোরী মেয়েটিকেও যে নিজের অস্ত্রে পরিণত করে।

একটা বই তুলে নিয়ে বলি, বাড়ী যাও। দেরী হলে বকবে।

: বকলে কি হয়? সব সময়েই তো বকছে। আপনার ঘরে কত বই! স্কুলে ভর্তি করিয়ে আমার নামটা কাটিয়ে দিলে। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে দু'তিন মাস স্কুলে গেলাম, তারা কি ভাবছে বলুন তো?

বইটা গুটিয়ে রাখতে হয়।

: ভাবুক না। তোমাদের এখন সময়টা খারাপ পড়েছে—

: বাড়ীওয়ালার মেয়েটা ইস্কুলে যাবার সময় আজকেও তামাসা করে গেল, কিরে মলুয়া, ইস্কুলে যাবি না? আমার কান্না পায় না বুঝি!

আলেয়া আচমকা টাকা ধার চেয়ে চারটি টাকা পেয়ে কেঁদে ফেলেছিল। সে ছিল আরেক রকম ব্যাপার। মলয়া একটা চেয়ে নিয়ে গা ঘেঁষে এসে মুচকি মুচকি হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছে।

: তুমি বড় ছিঁচকাঁদুনে হয়েছ মলু।

মলুয়া এক পা সরে দাঁড়ায়। হাঁটুর কাছে মাথা নামিয়ে ফ্রক দিয়ে চোখ মোছে। ভাল ছাপা ছিটের গাউন প্যাটার্ন ফ্রক, পুরোনো বিবর্ণ হয়ে এখন এখানে ওখানে ছিঁড়ে গেছে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে টাকাটা আমার গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে সে চলে যায়।

: চাইনে আপনার টাকা।

নোট নয়, ধাতুর টাকা। আমার গায়ে লেগে মেঝেতে পড়ে যায়— কিন্তু তেমন ঝন ঝন করে বাজে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি। মানসী কেন আমার পরিবারের বিপদ হয়েছে বুঝতে পেরেছি। ধ্বংসের মুখে একটি পরিবারকে দেখলে আরেকটি পরিবারের উঁচুতে উঠবার অবলম্বন হারানোর ভয় আর নীচে নেমে যাবার আতঙ্ক চিনতে কষ্ট হয় না। মানসীর বাপদাদার অনেক ক্ষমতা। তারাই আমাদের তুলতে পারে নামাতে পারে।

কিন্তু এসব চিন্তা তখন তুচ্ছ হয়ে গেছে আমার কাছে।

একটি কিশোরী মেয়ে আমাকে পারিবারিক জীবনদর্শন থেকে মুক্তি দিয়েছে।

কাগজ নেই। সাদা ভাল কাগজ। ডায়েরীর পাতা বড় ছোট, তাতে কবিতা লিখতে ইচ্ছা হয় না। দেয়াল থেকে ইংরেজী বাংলা দেয়ালপঞ্জীটা নামিয়ে উল্টে নিয়ে লিখতে সুরু করি—

চাতকের প্রাণ গেছে
মেঘের আশ্বাস ধ্বনি শুনে!
চাতকিনী কিশোরী রাধার
প্রাণটুকু শুধু ছিল প্রেমের খেলায়—
বজ্রদগ্ধ প্রেমিকের মরণ চীৎকারে
চাতকের প্রাণটুকু গেছে।
ওই মরে পড়ে আছে বিবর্ণ বিশীর্ণ দুর্বাঢাকা,
তৃষার্ত মাটিতে।
কিশোরী মেয়ের মত
এতটুকু পাখী তার কতটুকু প্রাণ!
দিয়ে গেছে অভিশাপ বজ্রের সমান!

বৌদি এসে বলেন, ঠাকুরপো, নাবে না খাবে না আজ? তোমাকে একটা কথা বলতাম, কিন্তু ভরসা হচ্ছে না। দেড়টা বেজে গেল, যদি নেয়ে খেয়ে নিতে—

: ভীষণ খিদে পেয়েছে বৌদি! দাঁড়াও, চট করে নেয়ে আসছি। খেতে দিয়ে কথাটা বোলো?

কথা আর কিছু নয়, অনেক ভেবে বৌদি একটি যুক্তি আবিষ্কার করেছেন। দু'তিনটে বছর যদি অপেক্ষাই না করতে পারে মানসী আমার জন্য, কতটুকু মূল্য আছে তার ভালবাসার? একে কি ভালবাসা বলে? এমন হাল্কা যার মতি, এমন অনিশ্চিত যার প্রেম, কেন আমি তার জন্য সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করতে যাব, নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করব?

: তুমি ক্ষতিপূরণের কথা বলছিলে। যে মেয়ের এটুকু সবুর সইবে না, তাকে হারালে কিসের ক্ষতি!

এত বেলাতেও আজ ভাত ডাল মাছ তরকারী সব গরম। খেতে আমার প্রায়ই বেলা হয়। ঢাকা ভাত ঠাণ্ডা করকরে হয়ে থাকে। আমি ভাত মাখতে মাখতে বলি, ক্ষতি বৈকি! সব কিছু বাড়বে কমবে বদলাবে, শুধু ভালবাসা ঠিক থাকবে মানুষের! ওটা বাজে কথা। তবে তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এখন বিয়ে করার ইচ্ছে আমার নেই, সুবিধাও নেই।

বৌদি যেন আকাশ থেকে পড়েন।— ওমা, তুমিই না সকালে বললে— ?

: কি বললাম? তুমি বললে মেল্লামেশা কমিয়ে দিতে, আমি বললাম তা পারব না। বিয়ের কথা তুমিই তুলেছিলে।

: ও!

গভীর অতল গহন এক রহস্যের সন্ধান যেন বৌদি

পেয়েছেন। কল্পনাতীতের মুখোমুখি হওয়ার বিস্ময় দেখা দেয় তার মুখে। সত্যই তিনি বাক্যহারা হয়ে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকেন।

আমি কবি। সেটা জানাই ছিল এতদিন। আমি আছি আর আনুষঙ্গিক ওই একটা বাড়তি দিক আছে আমার— আছে থাক, না থাকে না থাকবে, কে তা নিয়ে মাথা ঘামায়। আমি ছিলাম একটা মানুষ, আজ পর্যন্ত কবি হয়ে উঠতে পারি নি,— কবিতা লিখেও নয়, কবিতা ছাপিয়েও নয়!

আজ এখন একমুহূর্তে বৌদি যেন টের পেয়ে গেছেন যে, তাই তো, এ ছেলেটা যে সত্যই একটা কবি!

একটা মেয়েকে এ বিয়ে করবে না, মেলামেশা চালিয়ে যাবে! শুধু তাই নয়, ডালভাত মেখে খেতে খেতে ডাল-ভাত খাওয়ার মত অনায়াসে বিনা দ্বিধায় সেটা ঘোষণাও করে দিতে পারে!

কি বলতে গিয়ে বৌদি চুপ করে যান। প্রথম বিস্ময় কেটে যাবার পর তাঁর মুখে নানা বিচিত্র ভাবের খেলা চলতে থাকে। নিজের মনে কি কথা ভেবে বোধ হয় লজ্জাতেই তিনি চোখ বোজেন। চোখ মেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়েই মুখ নামিয়ে নেন।

দু'একদিনের মধ্যেই টের পাই আসন্ন বিপদের শঙ্কাতুর দুশ্চিন্তার ভাবটা কেটে গেছে সকলের মুখ থেকে। সকলের

মুখ শুধু গম্ভীর, আমার সঙ্গে একটু সংযত নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। হঠাৎ ছেলেমানুষত্ব খসে গিয়ে আমি যেন বয়স্ক মানুষের পর্যায়ে প্রমোশন পেয়েছি। সমস্ত পরিবারটি আমাকে নীরব নিষ্ক্রিয় অসমর্থন জানায়, আর কিছুই বলে না।

পরদিন মানসী এসে সকলের পরিবর্তন লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়ে যায়।

বৌদির উদাস গম্ভীর ভাব আর ভাসা ভাসা কথা শুনে প্রথমে বৌদিকেই সে জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে বৌদি?

: কিছু হয় নি তো!

তারপর মানসী প্রশ্ন করে আমাকে। আমার ঘরে এসেই প্রশ্ন করে। আমি মানস চোখে দেখতে পাই আমার ঘরের দিকে আসবার সময় সকলে কি দৃষ্টিতে মানসীকে লক্ষ্য করেছে!

মানসীর প্রশ্নের জবাবে বলি, ব্যাপার কিছুই না— আবার মনে করলে বেশ গুরুতরও বটে। আমাদের মেলামেশা সবাই পছন্দ করছে না।

মানসী খানিক চুপ করে থেকে বলে, কি বিশ্রী জগতে আমরা বাস করি!

: মোটেই না। এর চেয়ে সুশ্রী জগৎ তুমি কোথায় পাবে?

পাঁচ

আমার এক কবি বন্ধু বলেন, রাজপথে হাঁটার সময় তার মনে হয় তিনি যেন মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেছেন! আর কোনদিন কবিতা লিখতে পারবেন না। এতরকমের এত মানুষ, কত বিভিন্ন কাজ ও অকাজ, কতরকমের চিন্তাভাবনা কামনা বাসনা, কতরকমের মুখ আর চোখে কতরকমের চাউনি! কাকে বেছে নেব, কি বেছে নেব কবিতার জন্য? এমনিই যে দিশেহারা হয়ে যেতে হয়!

পথে মানুষের ভিড়ে আমিও নিজেকে হারিয়ে ফেলি,—ভিড়ের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাই। বিচিত্র বেশ আর বিচিত্র বয়সের পথ-চলা ব্যস্ত মানুষগুলি এক সমগ্রতার ঐক্য জানিয়ে আমায় আপন করে নেয়। ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পালিশ করা জুতা পরা মানুষটার সঙ্গে অর্ধ উলঙ্গ ধুলোমাখা ফাটা পায়ের মানুষটার পার্থক্য মুছে যায় না, এক হয়ে যায় না আশায় আনন্দে উজ্জ্বল মুখখানার সঙ্গে বেদনাকাতর উদ্বিগ্ন মুখ, পাশাপাশি চলতে চলতে জীবনের দুপ্রান্তেই দাঁড়িয়ে থাকে স্কুলের ছেলে আর আপিসের বুড়ো কেরানী, ধোঁয়া মিশে গেলেও এক হয়ে যায় না কাছাকাছি দু'টি মুখের সিগারেট আর বিড়ি। এই বৈচিত্র্যকেই একসূত্রে গেঁথে

দিয়েছে জীবনের একাভিমুখী গতি : পথে-হাঁটা মানুষ পথে দুদিকেই হাঁটে, পরস্পরের পাশ কাটিয়ে চলে যায় বিপরীত দিকে কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার পথ শুধু পিছন থেকে সামনের দিকে, পাথেয় শুধু জীবনকে এগিয়ে নেবার সংগ্রাম।

জীবন পেয়ে যে সদ্যোজাত শিশু কেঁদেছে আর মরণের দুয়ারে এসে যে বুড়ো ক্ষীণ নির্জীব ভাবে কেশেছে, তাদেরও বেঁধে রেখেছে জীবনের যে সমগ্রতা, পথ-চলা মানুষের ভিড়েও তার জীবন্ত সত্য রূপ।

যে বেশী বঞ্চিত? আগামী জীবনে তার সঞ্চয় বেশী। যে বেশী ক্ষুধাতুর? তার চেয়ে কম ক্ষুধাতুরের সে আগামী দিনের অন্নদাতা।

এই চলমান মানুষ সভায় জমে। একাংশই জমে— কিন্তু সমগ্রেরই তা প্রতিনিধি।

আমার কবিতা শোনার জন্য জমে না! একেবারে না-ই বা বলি কি করে? কবিতা গান তো বাদ পড়ে না অতি কড়া মেজাজের রাজনৈতিক সভাতেও।

সুময় বলেন, অনেক লোক হয়েছে কিন্তু!

মানসী বলে, তাতো হবেই। ভাতকাপড়ের দাবীর সভাতে লোক হবে না?

সুময় আমার দিকে চেয়ে হেসে বলেন, তুমি বুঝি তাই ভাতকাপড়ের দাবীর কবিতা লিখছ? সহজে পপুলার হবে?

আমিও হেসে বলি, ভাত-কাপড়ের কবিতা লিখে কবি কি পপুলার হয়? ভাতকাপড় যারা চায় তাদের প্রাণের কবিতা লিখতে হয়!

মানসী বলে, এই রে, লাগলো বুঝি দুই কবিতে!

মানসীর কথায় সুময়ের মুখে একটু হাসিই ফোটে। মানসীর বাড়ীতে একদিন আমার একটি সরল প্রশ্নে তার মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে ছিল আলাদা কথা। আমি মস্ত বিজ্ঞের মতো জানতে চেয়েছিলাম, আবৃত্তি করার যোগ্য কবিতা তার লেখা আছে কিনা। পাঁচজনের সামনে— বিশেষ করে মানসীর সামনে— এরকম প্রশ্নে একজন নামকরা কবির অপমান বোধ হওয়া আশ্চর্য কি?

কিন্তু আজ মানসী তামাসা করেছে আমাকেও একজন কবি করে দিয়ে— তার সমান পর্যায়ে তুলে! লাগলো বুঝি দুই কবিতে— দুই কবি। অর্থাৎ কবি আমরা দু'জনেই। কোথায় সুময় আর কোথায় নব— একজনের নাম শিক্ষিত মানুষ সবাই জানে, সাময়িক পত্রে নিয়মমতো কবিতা বেরোয় এবং যথানিয়মে ইতিমধ্যেই তার দু'খানা কাব্যসংকলন প্রকাশিত হয়েছে,— আরেকজন জনসভায় বক্তার মতো আবৃত্তি দিয়ে আসর মাতিয়ে কবি হতে চায় এবং সে ছেলেমানুষ কলেজের ছাত্র মাত্র!

এটা হাস্যকর উপমা!

সুময় তাই সদয় ভাবেই হাসে। কবি বলে মানসী

অপোগণ্ড আমার পিঠ যদি দু' একবার চাপড়াতে চায় সেটাই তো প্রমাণ যে তার তুলনায় আমি অপোগণ্ড।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সভাতেই মুছে যায় সুময়ের মুখের হাসি।

পাশাপাশি আমরা বসেছি। তাকে বাদ দিয়ে আমায় বলা হয় সভায় কবিতা শোনাতে। একবার নয় দু'বার। এ সম্মান আমার কবিতার প্রাপ্য খুব সামান্যই, আমি জানি মূল্য পেয়েছে আমার আবৃত্তি করার ক্ষমতা।

নতুন কবিকে সহজে কি কেউ মূল্য দেয়! না দেয় ভালই করে। নতুবা আজও কি কবির এত মূল্য থাকত জগতে!

কবি হওয়া সহজ নয়।

রাতের পর রাত জেগে অনেক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে জীবনের অনেক মালমশলা জ্বালিয়ে যাঁরা বিদ্বান নাম কিনে অর্থবান হয় আজও জগতে কবি তাঁদের চেয়ে বড় হয়ে আছে!

জীবনপাত করে জগতে যারা কোটি কোটি টাকায় ছিনিমিনি খেলার ক্ষমতাযুক্ত ব্যবসায়ী হয়েছে, কবি আজও জগতে তাদের মাননীয় হয়ে আছে।

মানুষ কি সস্তায় কবি হয়?

কত অজানা অচেনা কবি কাব্য সাধনায় প্রাণ দিয়েছে, কাব্য-রসিক কি সে হিসাব রাখে? কবিতা লিখতে চেয়ে মরে গিয়ে কয়েকজন কবি স্মরণীয় হয়েছেন মানুষের।

মানুষের ভাববারও সময় নেই যে এঁরা অঘটন নন, অবতার নন। কাব্য সৃষ্টি করতে চেয়ে শত শত কবি যে প্রাণ দিয়েছে— এঁরা সেই সাধনারই প্রতীক। মাইকেল অকালে মরেছেন। আমি জানি কত শত অজানা কবির মরণ-পণ সাধনার তিনি সাফল্য সার্থকতার প্রতীক!

আমার কবিতা আবৃত্তির পর জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সেই সভাতে বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক যামিনী কর্মকার। তাঁর বক্তৃতা শুনতে শুনতে মনে হয়, বিজ্ঞান ও কাব্যের, বৈজ্ঞানিক ও কবির, কৃত্রিম ব্যবধান ঘুচে গিয়ে এবার বুঝি স্বাভাবিক ব্যবধানটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে!

সৃষ্টিতে নর আর নারীর যে ব্যবধান— আমার আর মানসীর মধ্যে যে ব্যবধান।

পুরুষ ও নারীর সংঘাত, বিজ্ঞান ও কাব্যের সংঘাত— এটম বোমাও তো জন্মেছে এই সংঘাতেই! এই সংঘাতই এটম বোমাকে পরিণত করবে পুরুষ ও নারীর, বৈজ্ঞানিক ও কবির অ্যাটমিক এনার্জিগত অগ্রগতিতে।

অথচ সভায় আজ সুময়ের কিরকম কাঁদ' কাঁদ' মুখ! বিজ্ঞান যেন তাকেই হার মানিয়ে দিয়েছে, তার সঙ্গেই যেন বিজ্ঞানের যত কিছু ঝগড়া, যেহেতু সে কবি!

সত্যিই কি কবি? কবি কি কখনো এমন ছেলেমানুষ হয়?

হয়তো হয়!

কত ছেলেমানুষ বৈজ্ঞানিক সস্তায় মানুষকে খুশী করতে চেয়ে নিজের সুখ খুঁজছে— নিছক নিজের সস্তা সাধারণ সুখ, যার জন্য কারো বৈজ্ঞানিক হওয়ার দরকার হয় না!

সভা শেষ হলে মানসী রাগ করেই আমায় বলেছিল, তোমার সঙ্গে চলা দায়।

: কেন ?

: সব ব্যাপারেই কি তোমার আসল কথা টেনে আনা চাই ?

: আমি তো শুধু দুটো কবিতা আবৃত্তি করেছি !

: ভূমিকা করোনি ? ভূমিকার নামে বক্তৃতা ?

: কোন কোন কবিতার একটু পরিচয় দরকার হয়। কখন কি উপলক্ষে লেখা কিম্বা...... যেমন ধর দ্বিতীয় কবিতাটা। চাষীর মেয়ে পেটের দায়ে ধান কলে খাটতে এসে ধর্ষিতা হয়েছে, হাজার হাজার মন ধানের মধ্যে সে একা কি ভাবছে, তাই হল কবিতার বিষয়। এটুকু না বলে দিলে—

মানসীর মুখ অন্ধকার হয়ে এসেছিল।

: আর বিষয় ছিল না ? কবিতা ছিল না ?

: কেন, কবিতাটা তো অশ্লীল নয়। একটি কথাতেও কারো আপত্তি হওয়া উচিত নয়।

: ভূমিকাটা না করলে আপত্তি হতো না। কবিতায় যা লিখেছ শুনিয়ে দেবে, ফুরিয়ে গেল। কোথায় কোন চাষীর

মেয়ে, তার কত বয়েস, ধান কলে কি হল— অত দিয়ে তোমার দরকার কি ?

আমি হেসে বলেছিলাম, দরকার আছে বৈকি। নইলে কবিতাটার মানে বুঝত না লোকে।

তারপর চার পাঁচদিন মানসী আমার সঙ্গে কথা বলে নি।

ছয়

কবিতা লিখি কেন ?

এক কথায় একভাবে না হোক, মানসী আর তৃপ্তি দু'জনেই অল্পদিন আগে পরে আমাকে এই প্রশ্ন করেছে।

একজন খুব গুরুত্ব দিয়ে, আরেকজন হাল্কা তামাসার সুরে। দুজনকেই আমি পাল্টা প্রশ্ন করেছি : লোকে কবিতা পড়ে কেন ?

প্রশ্ন করে জবাব এড়িয়ে গিয়েছি, কারণ আমি সত্যই জানি না কেন আমি কবিতা লিখি— কবি কেন কবিতা লেখে ! আর্টের মানে নিয়ে অনেক বই পড়েছি, তর্ক-সভায় হাজির থেকেছি, নিজে তর্কও করেছি। জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে অনেক থিয়োরি আর থিয়োরির হরেক রকম ব্যাখ্যার খিচুড়ি— স্বস্তি যেন তাতেই। যাক্‌গে, এ প্রশ্নের আর মীমাংসা নেই ! ধাঁধাঁয় পাক খাওয়াই এর মীমাংসা !

আশ্চর্য এই, এরা দু'জন চেপে ধরার আগে আমার খেয়ালও হয় নি যে আমি নিজেও তো কবিতা লিখি, একবার নিজের কথাটা ভেবে দেখি না কেন, আমি কবিতা লিখি কেন— কি আমার দরকার পড়ল কবিতা লেখায় ! এতসব

থিয়োরিতে আমি পণ্ডিত— নিজের বেলায় পাণ্ডিত্য খাটিয়ে একবার পরখ করে দেখলে দোষ কি! পরের মুখে ঝাল খেয়ে খেয়েই কি দিন যাবে?

কবিতা লেখা বড় কষ্ট। বিনা কষ্টে একটা কবিতা তো আজ পর্যন্ত লিখতে পারলাম না! লিখি আর কাটি, কাটি আর লিখি, একখানা কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আরেকটি কাগজে নতুন করে আরম্ভ করি। যদি বা কখনো একটা কবিতা তরতর করে লিখে গেলাম— মনে হল, এতদিনে সত্যি সত্যি খাঁটি অনুপ্রেরণার বশে খাঁটি একটা কবিতা লিখে বসেছি, এর কমা সেমিকোলনও বদলাবার দরকার নেই। সেই কবিতা ছিঁড়ে ফেলে দিলাম পরদিন— আবার নতুন করে লিখতে হবে।

ইনস্‌পিরেশন তবে কাকে বলে?

আমি কি আসলে তবে কবি নই? ঘষেমেজে গায়ের জোরে নেহাৎ চর্চা করছি মাত্র? কবিতা লিখে নাম করার আসল ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছি: একটা কবিতা লিখে সেটা চেষ্টা করে প্রকাশ করার মধ্যে অকবিত্ব কিছুই নেই। ওখানে শুধু ছেলেমানুষি আর বাস্তববুদ্ধির টানাপোড়েন।

কিন্তু সত্যই আমি কবি কিনা সে প্রশ্নের জবাব কে দেবে?

নাম কিছু হয়েছে বটে। লোকে কবি বলেই খানিকটা গণ্য করছে সত্য। কিন্তু চেষ্টা করে এটুকু ফাঁকি দিতে কি

মানুষ পারে না? আসলে স্বাভাবিকভাবে যে যা নয় সে ইচ্ছাশক্তি আর অধ্যবসায় দিয়ে খানিকটা তাই হতে পারে বৈকি! ইচ্ছা আর চেষ্টায় সবই খানিকটা সম্ভব হয়।

খাদ্যে অরুচি জন্মে। কাজে আলস্য আসে। রাত্রে ঘুম আসে না। কত যে অপরাধ করেছি এই সদ্য সাবালকত্ব পাওয়া' জীবনে তার যেন হিসাব হয় না এমনিভাবে দিবারাত্রি ছটফট করি। কারো কাছে কিছু বলারও নেই। করারও নেই।

বৌদি চমকে গেছেন টের পাচ্ছিলাম। একদিন রাত প্রায় এগারোটার সময় দেহের বিদ্রোহ আর অস্থিরতা অসহ্য মনে হওয়ায় ভাবলাম, আর কেন, এবার আত্মসমর্পন করা যাক। পুঁটুলি খুঁজে পেতে একটা দশটাকার নোট আর ধাতুর টাকা পেলাম সাতটা। এতে কি হবে? বস্তিতে দেশী কোন নেশায় আত্মহারা হয়ে রাতটা কাটানো যাবে?

কবির আত্মসমর্পণ মানেই সাময়িক ভাবে সংঘাত এড়িয়ে যাবার জন্য সাময়িক পরাজয় মানা। জীবন সংঘাতময়, মহান স্থষ্টির প্রেরণার সঙ্গে অনেক বিরোধী ভাবের সংঘাত কবিত্ব লাভেরই একটা অনিবার্য প্রক্রিয়া। এ সমস্তই আমি জানি। অসামঞ্জস্যকে আয়ত্ত করে এই প্রক্রিয়া থেকেই বেরিয়ে আসবে নতুন স্থষ্টি। কিন্তু সহ্য যে হয় না? যাঁতা কলে ক্রমাগত পিষে যাওয়ার মতো, বোমাটির বিদীর্ণ হবার মুহূর্ত

দিবারাত্রিতে পরিণত হওয়ার মতো আমার অবস্থা। অপচয় অনাসৃষ্টির মধ্যে এই চাপ নষ্ট করে দিয়ে আমি মুক্তি চাই।

আত্মহত্যা করার চেয়ে এ তো অনেক ভালো।

বৌদি পথ আটকাল।

: না। সারাদিন খাওনি— সারাদিন ঘরে বসে পাগলের মত করেছ। এখন আমি তোমায় বাইরে যেতে দেব না।

: পথ ছাড়। আমি কিন্তু যা খুশী করতে পারি এখন।

: যা খুসী কর, পথ ছাড়ব না। একঘণ্টা পরে যেও, যদি অবশ্য ঘুমিয়ে না পড়।

: ঘুম পাড়িয়ে দেবে ?

: দেব।

: ভেবে চিন্তে বলছ ? আমি কোন অবস্থায় আছি জেনে বলছ ?

: বলছি বৈকি। তুমি এখন উন্মাদ। নইলে এত রাতে টাকা নিয়ে নিজেকে ধ্বংস করতে যাচ্ছ ?

: উন্মাদের কিন্তু বিচার বিবেচনা কাণ্ডজ্ঞান কিছুই থাকে না।

: কি করা যাবে ? আমি তোমার জ্বালা জুড়িয়ে দিতে পারি, তোমায় বাঁচাতে পারি। চেষ্টা না করে তোমায় কি করে যেতে দেব ?

আমি কড়া স্বরে বলি, ছি! মায়া কর বলে কি বিচার বিবেচনাও বিসর্জন দিতে হবে ?

: আমার বিবেচনা ঠিক আছে। তুমি এখন বুঝবে না।

আমি অপলক চোখে চেয়ে থাকি। বাঘের কাছে কাঁচা মাংস নিয়ে যাওয়ার মতো এই রূপ যৌবন নিয়ে এখন আমাকে শান্ত করতে চাওয়ার দুঃসাহস কোথা থেকে আসে? আশা তো শুধু এইটুকু যে আমিই কিছুতে অমানুষ হতে পারব না। আমি যে এখন অন্য সময়ের সেই মানুষ নই, অমানুষিক উন্মাদনার এই স্তরে আমার কাছে এখন সমাজ সংসার নিয়ম নীতি শুধু তুচ্ছই নয় একেবারে অর্থহীন, এটা নিশ্চয় ভালো করে বোঝে নি। নইলে ওই আশাটুকু সম্বল করে শেষরক্ষার ভরসা করত না।

এগিয়ে এসে একটা কাণ্ড করে অদ্ভুত। আমার মাথাটা বুকে চেপে ধরে কেঁদে ফেলে।

: তোমায় আমি কিছুতেই যেতে দেব না। প্রথমে মায়ের মত চেষ্টা করে দেখি। যদি না পারি তখন দেখা যাবে।

প্রথমে মায়ের মত চেষ্টা— মা!

জোর করে মাথা তুলে বলি, দম আটকে মরে যাব বৌদি। দোহাই তোমার।

বৌদি চোখ মুছতে মুছতে বলে, একদিন একটু আদর করতে চাইছি, এটুকুও দেবে না? তোমার কত সেবা করেছি, তারও কি একটু দাম নেই? আজ বাইরে গেলে জীবনে আর তোমায় আপন ভাবতে পারব না। মায়া

মমতা সব শুকিয়ে যাবে। সারাটা রাত পড়ে আছে, পরেই নয় বেরিয়ে যেও।

: আদর সয় না বৌদি। হার্টফেল করবে মনে হয়।

: আজ ফেল করবে না। একদিন পরীক্ষা করেই খ্যাখো না কি হয়, ওষুধ খাওয়ার মতো আদরটা মেনে নাও? পালিও না কিন্তু, খাবার আনছি। নিজের হাতে তোমায় খাইয়ে দেব। আমার কোলে মাথা রেখে তুমি শোবে।

তার সে রাত্রির সর্বাঙ্গীন অদরের সত্যই বর্ণনা হয় না।

আমার ভিতরের আগুণ যে কামাগ্নির চিতা নয়, কবি আমি যে গীতগোবিন্দের ঐতিহ্যের জের টানতে বসি নি, এটা বুঝাবার মত গভীর দৃষ্টি আর বোধ শক্তি সে কোথায় পেল কে জানে।

শুধু কথায় নয়, সেবায় নয়, বিনা দ্বিধায় তার তরুণ কোমল অঙ্গের নিবিড় স্নেহস্পর্শ দিয়ে বিদ্রোহী শিশুর মতই আমাকে সে জয় করেছিল।

সত্যই স্নেহ করত। কিন্তু এই দুর্লভ উদার চেতনা সে কোথায় পেয়েছিল যে স্নেহস্পর্শের সীমা কোন রীতি নীতির আইনে বেঁধে দেওয়া নেই, মায়ের কোলে স্তন পান করতে শিশুর সর্বাঙ্গে যে পুলকের সঞ্চার হয়, বালক না হলেও সেদিন তখন আমি তার ঘনিষ্ঠ স্পর্শে তেমনি আনন্দের স্বাদ পাব— আজও অবাক হয়ে ভাবি।

সামনে বসে নয়, পাশে গা ঘেঁষে বসে বাঁ হাতে আমায়

জড়িয়ে গায়ে চেপে ধরে রেখে অন্যহাতে ভাত মেখে মুখে গেরাস তুলে সে আমায় খাইয়েছিল, তার কোমল অঙ্গের স্পর্শে সর্বাঙ্গে আমার রোমাঞ্চ আর শিহরণ বয়ে গিয়েছিল।

মনে হয়েছিল আমার একার জগতে, বর্ষণহীন সজল নিবিড় মেঘে ঢাকা আকাশ আর শুষ্ক তপ্ত ধূ ধূ করা মরুভূমির জগতে হঠাৎ পেয়ে গেছি একাধারে মূর্তিমতী মা আর প্রিয়াকে।

সত্য কথা বলি। প্রথমে মোটেই ভালো লাগে নি। কোমল হোক মধুর হোক বাঁধনে আটক পড়ার আতঙ্কে কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রচণ্ড আতঙ্ক জেগেছিল।

আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে জল খেতে গেলে প্রথমে যেমন ঢোঁক গেলা যায় না, মনে হয় তৃষ্ণা আর জলের বিরোধ যেন গলা টিপে ধরেছে, তার স্নেহসিক্ত আদর নিতে প্রথমে আমার তেমনি বেধে গিয়েছিল।

ভেতরটা সত্যই যেন আমার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, তার অনুপম স্নেহের রসে ধীরে ধীরে সরস করে আনল।

তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আমি যেন জুড়িয়ে গেলাম, শান্ত আর সহজ হয়ে গেলাম।

আমায় ঘুম পাড়িয়ে বৌদি কখন চলে গিয়েছিল জানি না। সকালে উঠে রাতের কথাটাই ভাববার চেষ্টা করছিলাম, বৌদি চা নিয়ে এল গম্ভীর মুখে।

কত সেবাই যে তোমার চাই!

একরাত্রে জগৎ যেন আমার ওলটপালোট হয়ে গিয়েছে। চা খেতে খেতে হেসে বললাম, নাই বা বাঁচাতে আমাকে!

: তাই নাকি! তোমার তাই মনে হবে। কিন্তু এটুকু না করলে সংসারে আছি কেন? গা বাঁচিয়ে পেট পুরে খেয়ে শাড়ীগয়না পরতে? বড় বড় কথা জানি নে ঠাকুরপো, আমাদের অনেক দোষ, অনেক সঙ্কীর্ণতা। কিন্তু সংসারটি ছাড়া আমাদের কি আছে বলো? চারদিক বাঁচিয়ে চলতে হয়। স্নেহ মায়ার কারবার করে বসেছি, উপায় কি! নিজের দোষে তুমি রোগ করেছ, কিন্তু তোমায় ধ্বংস হতে দিলে আমিই জ্বলে পুড়ে মরতাম না?

বৌদির চোখে জল দেখে কি বলব ভেবে পাই না।

বৌদি চোখ মুছে নিজেই আবার বলে, তুমি ব্যাটাছেলে, তেজী ছেলে, নিজের পথ তুমি খুঁজে নেবেই। কিন্তু এই বয়সটা বড় বিশ্রী। সাদামাটা সোজা কথা খেয়াল থাকে না। একদিকে ঝোঁক গেলে সামলাতে পারে না। মানুষ শরীর সর্বস্ব নয়, কিন্তু শরীরটা ডিঙ্গিয়ে গিয়েও কিছুই হয় না।

আমি আশ্চর্য হয়ে বৌদির কথা শুনি।

: দশ এগার বছর থেকে আমাদের এসব শিখতে হয়, ঠাকুরপো। তুমি খুব সংযমী ছেলে—

: মানসীর সঙ্গে এত মিলেও?

বৌদি শাসনের ভঙ্গিতে আঙ্গুল উঁচিয়ে বলে, বাহাদুরী কোরো না, ওতে মোটেই বাহাদুরী নেই। তোমার এই বাহাদুরীর কথা টের পেয়েই তো ভাবনা হচ্ছিল। তোমার খালি বাইরের সংযম— আর ভেতরে চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি। এ কখন সয় মানুষের ?

: উন্মাদনা কি অসংযম ?

: সীমা ছাড়িয়ে গেলে অসংযম নয় ? সামঞ্জস্য না থাকলে অসংযম নয় ? তাই তো বলছিলাম এ বয়সে ছেলেরা বোকা হয় কিন্তু তোমার মত বোকা খুব কম ছেলেই হয়। অন্য ছেলেরাও হয়তো এরকম আরম্ভ করে, খালি ভেতরের তাপটাকেও চড়িয়ে যায়। কিন্তু খানিক এগিয়ে তাদের সব ভেঙ্গে পড়ে, ভেতরে বাইরে একটা সামঞ্জস্য হয়ে যায়। কিন্তু তুমি তো আর সাধারণ ছেলে নও, তোমার সব খাপছাড়া ব্যাপার। বুদ্ধিটাও যে তোমার আবার ঢের বেশী চোখা। নাওয়া খাওয়া ঘুচে গেছে, একঘণ্টার জন্য ঘুম হয় না, শরীরের যন্ত্রণায় ছটফট করছ— তবু কি একবার খেয়াল হবে যে ভেতরের জ্বরের জন্য এরকম হয়েছে, আমার আর কোন রোগ নেই ?

ম্লান মুখে জিজ্ঞাসা করি, বাইরের সংযমটা এ অবস্থার চিকিৎসা নাকি বৌদি ?

বৌদি হেসে বলে, সংযম কেন বলছ, সামঞ্জস্য বল। অন্য চিকিৎসাও আছে। তুমি কবি, ভাবুক মানুষ, ভাবাবেগ

তাতিয়ে তাতিয়ে অন্তর্জ্জর তুমি করবেই। কিন্তু সেটা সীমার মধ্যে রেখে কর, অন্যদিকেও তাকাও। দু'একদিন না খেলে কিছু হয় না, বরং মাঝে মাঝে উপোস দেওয়া ভালো। কিন্তু খিদে যখন মরে যাচ্ছে— তখন খিদের প্রাণটা বাঁচাও কাব্য রেখে? ঘুম আসে না— ঘুমটা আনার ব্যবস্থা কর?

: তার মানে স্বাস্থ্য?

: স্বাস্থ্যটা কি ফেলনা? গত সপ্তাহে কটা কবিতা তুমি লিখেছ ঠাকুরপো?

: লিখেছি অনেকগুলি। লিখে আবার পুড়িয়ে ফেলেছি।

বৌদি জয়ের হাসি হাসে। হাসবার অধিকার সে অর্জন করেছে বৈকি। সময়ে অসময়ে কারণে অকারণে আমি যে কথা বলি, জীবনের যে মূলনীতি প্রচার করি, আজ আমার দরকারের সময় সেই কথাগুলি সে আমায় শুনিয়েছে। আমার হারাণো খেই ধরিয়ে দিয়েছে আমার হাতে।

বৌদির স্নেহে আমার বিশ্বাস ছিল না। সে অবিশ্বাসও আমার একমুখী উগ্র ভাবচর্চার ফল। জীবনের মানে যেমন বাঁধা হয়ে গিয়েছিল অনুভূতির তন্ত্রী ছিঁড়ে যাবার চড়া পর্দায়, একাভিমুখী প্রবল বন্যার মতো নিয়ম নীতি বিচার বিবেচনা বর্জিত উদ্দাম স্নেহ ছাড়া স্নেহের মূল্যও ছিল না আমার জগতে। কাল তার স্নেহে বিশ্বাস ফিরে পেয়েছি। আজ ফিরে পেলাম তার সহজ বাস্তব বুদ্ধিতে শ্রদ্ধা।

ঘরের একটি বৌ, রাঁধে বাড়ে পাঁচজনের সেবা করে আর

সঙ্কীর্ণ স্বার্থ শাণায়— সেও নিজের মত করে জানে যে যোগ-সাধনার মতই কাব্যসাধনারও নিয়মনীতি আছে, যা না মানলে মুস্কিল হয়! সেও বোঝে যে আভ্যন্তরীণ জগৎটা বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়!

শুধু জানাবোঝা নয়, একজন আত্মবিস্মৃত বিপন্ন কবিকে অতি কঠিন মুহূর্তে সামলে নিয়ে ধাতস্থ করতেও পারে!

কি ভাবে যে ধীরে ধীরে জুড়িয়ে শান্ত হয়ে আসে চারিদিক। এক শান্তিময় গভীর অবসাদ অনুভব করি। ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর ভাবে টের পাই আমার সমগ্র সত্তা কোন্ অবর্ণনীয় অসহনীয় অবস্থা লাভ করেছিল— সাধারণ অবস্থার চেতন-অনুভূতির সঙ্গে তার কেমন আকাশ-পাতাল তফাৎ।

শান্ত স্বাভাবিক হবার আগে এটা টেরও পাই নি।

মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে এই অবস্থান্তর।

মনে পড়ে, কেন কবিতা লিখি এই প্রশ্নের একটা জবাব নিজের কাছে খুঁজে পাবার জন্য ব্যাকুল হবার পর দেহমনে একটা অদ্ভুত তন্ময়তার ভাব নেমে আসছে অনুভব করে-ছিলাম। জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা, চেনা অচেনা সমস্ত মানুষ আর বিচিত্র প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা। আমার ইচ্ছাই নিয়ন্তা সব কিছুর!

আমার আনন্দে জগৎ আনন্দময়, আমায় বেদনায় বিশ্ব-সংসার বিষণ্ণ নিঝুম। ছাতের কোণার আবর্জনার ছোট

চারটি থেকে গাছপালা পশুপাখী মানুষ সব আমারই রসাস্বাদে জীবন রসে থম থম করছে।

কেন কবিতা লিখি এ তার জবাব নয়। জবাব আমি এ ক'দিনে পাই নি। সাধকের সমাধি লাভের মতো এ হল কবির ক'দিন নিজের অন্তরে তলিয়ে যাবার অবস্থা।

সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে পরদিন বেলায় ঘুম ভাঙ্গে। রসকুণ্ডে ডুব দিয়ে উঠে আসার পরেও কাল ঘুমানো পর্যন্ত একটা চটচটে অনুভূতি ছিল দেহমনে, আজ সকালে সেটাও সম্পূর্ণ কেটে গেছে।

স্নান করে চা খাবার খেয়ে মানসীর কাছে যাবার কথা ভাবছি, সে নিজেই এসে হাজির হয়। মুখে তার দুশ্চিন্তার বোঝা।

আমার তাজা ভাব দেখে সেটা খানিক কেটে যায়। কিন্তু উদ্বেগ সে বেশীক্ষণ গোপন রাখতে পারে না।

: ক'দিন তোমার কি হয়েছিল ?

: কেন বল তো ?

আমি যেন কিছুই জানি না!

মানসী ক্লিষ্ট চোখে চেয়ে থাকে। কত দুর্ভাবনা, কত সংশয়, কত প্রশ্ন যে উঁকি মেরে যায় তার চোখে!

খানিক পরে মৃদুস্বরে বলে, সত্যি করে বল। নেশা করেছিলে ? ওরকম হয়ে গিয়েছিলে কেন ?

৬

: আগে বল্ল কি রকম হয়ে গিয়েছিলেম, তারপর বলছি কি হয়েছিল।

মানসী ভেবে বল্লে, কি জানি, বলা বড় মুস্কিল। কি ভাবে তাকাতে, কি ভাবে কথা কইতে, সব সময় কেমন যেন একটা—। জ্বরবিকারের রোগী যেমন করে সেইরকম! অথচ এদিকে জ্ঞান ঠিক আছে, পাও টলছে না। কথা যা বলেছ ক'দিন, শুনে মনে হয়েছে যেন কোন মহাপুরুষের আত্মাটাত্মা ভর করেছে। আমায় অধ্যাত্মবাদ বুঝিয়ে দিলে আধঘণ্টা ধরে, এমন আর সত্যি কারো কাছে শুনি নি। জানা কথাই বললে সব কিন্তু মনে হল তোমার কাছে শোনার আগে যেন এক বর্ণও বুঝি নি। তাতে আরও ভয় হয়েছিল।

: পাগলটাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি ভেবেছিলে তো?

নখ খুঁটতে খুঁটতে মুখ তুলে মানসী বলে, মিছে বলব না, কথাটা মনে হয়েছিল।

আমি হেসে বলি, কি হয়েছিল শুনবে? অসাবধানে পা পিছলে আমার ভাব জগতের রসের ডোবায় তলিয়ে গিয়েছিলাম।

মানসী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। বুঝিয়ে বলার পরেও তার সে দৃষ্টি ঘোচে না।

: এরকম তো প্রায়ই হবে তোমার? নইলে কবিতা লেখা ছেড়ে দিতে হবে। আমি জানি, একটি ছেলেকে দেখেছিলাম, কীর্তন করতে করতে দশা লাগত। প্রথমে

অনেকদিন পরে পরে লাগত, শেষে এমন হল, কীর্তনেরও দরকার হত না। হু'দিন ঠিক থাকে, হু'দিন ঘন ঘন দশা লাগে।

তাকে অভয় দিয়ে বলি, কবির কি ওরকম দশা সহজে হয়? এ একটা অঘটন ঘটে গেল। অনেকদিন থেকে অনেকগুলি যোগাযোগ ঘটছিল। আসল ব্যাপারটা শুনবে? আমার নিজেরই ভাব আবেগ চিন্তা অনুভূতি সব কিছু দিয়ে নিজেকে জানবার জন্য একটা উন্মাদনা সৃষ্টি করে দিন দিন সেটা বাড়িয়ে চলেছিলাম। সব কিছু উঠে আসছিল ঐ স্তরে। তোমার হাসিটা ভালো লাগে, সেখান থেকে চলে এসেছিলাম বিশ্বের হাসিকান্নার মানে দিয়ে আমাকে বুঝবার ব্যাকুলতায়। আমাকে মানে নিজেকে সেটা বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়? একি আর বার বার মানুষের জীবনে ঘটে? ব্যাপারটা তো বুঝে গিয়েছি।

মানসী খানিক চুপ করে থেকে বলে, দাদা যেবার প্রথম মদ খেল— পরদিন ঠিক এই কথা বলে সকলকে ভরসা দিয়েছিল। খেলে কেমন লাগে জানবার কৌতূহল ছিল— জেনে গিয়েছি। আবার খেতে যাব কেন? আজকাল রোজ খায়।

: ওটা নেশা।

: এটা?

: কবিতা লেখাকে তুমি মদের নেশার সঙ্গে তুলনা করছ!

মানসীর কাছে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিই কিন্তু সেইদিন গভীর রাত্রে চারিদিক যখন স্তব্ধ হয়ে এসেছে, সহরের ছাড়া ছাড়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দগুলি পেয়েছে এক রহস্যের ইঙ্গিত, তারাভরা আকাশে ছড়িয়ে গেছে সেই রহস্যময়তারই নিঃশব্দ আহ্বান, আশেপাশে চারিদিকে ঘরে ঘরে ঘুমন্ত মানুষগুলির কথা ভেবে এক গভীর ব্যাকুলতা জাগে আরেকবার সেইখানে ফিরে যেতে। কি আশ্চর্য আর অদ্ভুত ছিল ওই কয়েকটা দিন! এই এক মাটির পৃথিবীতে একই পরিবেশে রক্তমাংসের দেহ নিয়ে সাধারণ চলতি অস্তিত্বের মধ্যে কি অপরূপ রহস্যময় রোমাঞ্চকর জগতে চলে গিয়েছিলাম!

ইচ্ছা করলে আবার যেতে পারি! আজ না হোক কাল না হোক ইচ্ছা করলে দু'দিন বাদে আবার আমি পৌঁছতে পারি অপার্থিব সেই ভাবাবেশের জগতে, ক'টা দিন আত্মহারা হয়ে কাটিয়ে দিতে পারি আচ্ছন্ন অভিভূত অবস্থায়।

নিশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরাই। হে বাংলার কিশোর তরুণ কবি, কি মায়াসঙ্কুল মারীসঙ্কুল বিপজ্জনক কঠিন তোমার পথ?

সাত

এই মাটির জীবনকে আমি ভালবাসি। মানুষের সংগ্রামী জীবনের মর্মবাণীকে ভাষা দিতেই আমার কবি হওয়ার সাধ।

এই সহরের পাকা দালান থেকে বস্তির খোলার ঘর থেকে গ্রামের ওই খড়ের ঘরের অগণিত মানুষ আমার পথ চেয়ে আছে, উৎকর্ণ হয়ে আছে ছন্দে ও সুরে আমার আহ্বান শোনার জন্য। এ মিথ্যা কথা নয়, অলীক কল্পনা নয়। দেহের প্রতিটি অণু পরমাণু দিয়ে আমি লক্ষ কোটি মানুষের এই অসীম ধৈর্যের প্রতীক্ষা অনুভব করি।

আমায় তারা জানে না, চেনে না।

কিন্তু আমি তো তাদের অবিচল দৃঢ় আহ্বান শুনি। কে তুমি আসছ নবাগত কবি, ভাষা দাও, ভাষা দাও! আমরা তোমারি পথ চেয়ে মূক হয়ে আছি। হে আমাদের কবি, হে আমাদের নবজন্মের নবজীবনের নববসন্তের মুখর প্রতীক, আমরা তোমায় বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি, তুমি প্রস্তুত হয়ে এস!

কী রোমাঞ্চকর প্রাণান্তকর এই কবি হবার প্রস্তুতি! আমাতে যেন আর আমি নেই। বৃহত্তর জীবনের টানে আমি যেন সব হারিয়ে ফেলতে বসেছি কিন্তু খুশীর টানে

শিকড়গুলি উঠছে না, একটি একটি করে খুঁড়ে তুলে ফেলতে হচ্ছে শিকড়!

এ যে কি কষ্টকর প্রক্রিয়া, যে কবি হয় নি সে কি বুঝবে?

মানসী বলে, সত্যি, সে কি বুঝবে? আমি কবি নই, আমিও বুঝি না।

আমি মানসীর হাত চেপে ধরি।— বড় একা লাগছে। এসো না একসাথে থাকি?

তা, আমি কবি মানুষ। প্রস্তাবটা এরকম আচমকা এই ধরণের কোন একরকম ভাবে একদিন আসবে মানসীর এটা জানাই ছিল। কিন্তু আমি এমন শিশুর মতো একা থাকতে ভয় করে বলে তাকে সাথে থাকার আবেদন জানাব, এটা বোধ হয় সে কল্পনাও করে নি। বয়স কম হোক, কবি হই, মানুষটা আমি বেশ একটু জবরদস্ত। মানসীকে কত বিষয়ে অভয় দিয়েছি ঠিক ঠিকানা নেই।

: এখনি? তুমি কিছু একটা করার আগেই?

বৌদি উপস্থিত থাকলে নিশ্চয় হেসে ফেলত!

: ঘরসংসার পাতছি না। আমরা যেমন আছি তেমনি থাকব। শুধু—

মানসী মুচকে হাসে।

: সবাইকে বলবে তো এ কথাটা? আমরা যেমন আছি তেমনি থাকব, শুধু—?

: সবাইকে বলার দরকার !

: অন্ততঃ তোমার আমার বাড়ীর লোককে তো বলতে হবে ? আমাদের মতলব কি না জেনে তারা ছাড়বে কেন !

মানসী তেমনিভাবে মৃদু মৃদু হেসে যায়।

আমি শান্ত সুরেই বলি, তা নয়, তুমি বুঝতে পারছ না। তুমি আমি যেমন যাতায়াত করছি তেমনি করব। তোমার আমার মধ্যে শুধু একটা বোঝাপড়া হবে।

: ওঃ! সেই বোঝাপড়া ?

মানসী ভ্রু কুঁচকে বিস্মিত চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে। ধীরে ধীরে আবার তার মুখে রহস্যের হাসি ফোটে।

: নাঃ, কবি হলে কি হবে, তুমি সত্যি ছেলেমানুষ ! আমার ভুল হয় নি, সত্যি এখনো তোমার মধ্যে একটা শিশু আছে। তা বোঝাপড়া হবার আগেই তুমি যে বড় হাত ধরেছ আমার ?

: হাত ধরতে পারি।

: তাই নাকি ! তা এত কথা বকবক না করে হাত ধরে টানাটানি করে দেখলেই তো তোমার এই বোঝাপড়ার ব্যাপারটা চুকে যেত ! হয় আমি হাত ছাড়িয়ে নিতাম নয় তোমার গলা জড়িয়ে ধরতাম। এ বোঝাপড়াটা লোকে ওভাবেই করে, মুখের কথায় হয় না। সংসারে সবাই জানে, তুমি এটুকু জান না ? মেয়েরা মুখে এক কথা বলে, মনে অন্যরকম ভাবে, কাজে অন্যরকম করে ?

ক্ষুণ্ণ হয়ে বলি, তুমি বুঝতে পারছ না। এটা ওই সস্তা বোঝাপড়া নয়। মাঝে মাঝে একা বড় কষ্ট হয়, তখন আমি তোমায় চাই। কষ্ট যে কিরকম হয় তোমায় বলে বোঝাতে পারব না। শরীর মন দুয়েরই ক্ষতি হয়। মুস্কিল এই যে, আমার কোন অবলম্বন নেই। একা একা সামলাতে হয়। তুমি আমার অবলম্বন হবে।

মানসী অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, কবিতা লেখার জন্য এরকম হয়, না ?

: না লিখলেও হয়।

: কলম ধরে লেখো না লেখো, ব্যাপারটা তো একই।

অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে মানসী বলে, আমার একটা কথা শুনবে ? দু'তিন বছর তুমি কবিতা লেখা বন্ধ রাখো।

কথাটা শুনে আমার হাসি পায়।

: বন্ধ রাখতে চাইলেই কি বন্ধ রাখা যাবে ? তুমি আমায় সখের কবি ধরে নিয়েছো ! আমার প্রকৃতি হল কবির, কবিত্ব আমার স্বাভাবিক ধর্ম।

: তাই নাকি ! নিজের ওপর কন্ট্রোল নেই ?

: কি কন্ট্রোল ? নিজের স্বাভাবিক বিকাশ বন্ধ করা কি কন্ট্রোল ? গায়ের জোরে সেটা করা যায়, আমি নষ্ট হয়ে যাব, বিকৃত হয়ে যাব। ধ্বংস করে দেওয়া যায়, দু'তিন বছরের জন্য খুশীমত বন্ধ রাখা যায় না।

মানসী চেয়ে থাকে। কথাটা পরিস্কার হয় নি।

: একটা বিশেষ শক্তির বিকাশ হচ্ছে। এতো একটা প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই এমন ঘটতে পারে যে, দু'চার বছর কবিতা লেখার দিকে কিছুমাত্র ঝোঁক রইল না, একেবারে ভুলে রইলাম। সে হল একটা স্টেজ। কিন্তু জোর করে সেটা ঘটানো যায় না।

মানসী তবু চেয়ে থাকে।

: যেমন ধর, কাল বিকালে কলোনির ধারে তোমার বয়সী একটি মেয়েকে দেখলাম। ছেঁড়া একটা ডুরে কাপড় পরেছে, কলে কলসী ভরছে— জল পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। রাস্তায় গাড়ী চলছে তার খেয়াল নেই কিন্তু প্রত্যেকটি লোকের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে। যেন জিজ্ঞেস করছে, আমি কে জানো? আমি মেয়ে নই, আমি একটা মানুষ! কাল থেকে মনের মধ্যে ঘুরছে মেয়েটির চাউনি। আজ পর্যন্ত কবিতায় কত মেয়ে বৌ জানালার ফাঁক দিয়ে, দরজার আড়াল থেকে, রেলে নৌকায় গাড়ীতে রাস্তায় পথের লোকের দিকে চোখ তুলে চেয়েছে— সবাই তারা মেয়ে। তার বেশী দাবী তারাও করে নি। এ মেয়েটি বলছে, আমি মেয়ে নই, আমি মানুষ! ওর এই কথাটাকে ভাষা দিতে আমার মধ্যে কবিতা ভাঙ্গছে গড়ছে। একটি কবিতা বেরিয়ে আসবেই।

: তোমার পথে দেখা ওই মেয়েটিই বুঝি জগতে প্রথম

বলেছে যে, আমিও মানুষ? আর কোন মেয়ে আজ পর্যন্ত মনুষ্যত্বের দাবী তোলে নি?

আমার সশব্দ হাসি মানসীকে রীতিমত ক্ষুব্ধ করেছে দেখে হাসি বন্ধ করে বলি, এই তো, এইখানেই কবির সঙ্গে তোমাদের তফাৎ! তোমরা চল যন্ত্রের মতো, নতুন কথা ধরতেই পার না। এটা মেয়েদের সে দাবী নয়। এ মেয়েটি বলছে না যে, মেয়েজাত বলে আমায় তুচ্ছ কোরো না, আমিও পুরুষের মতই মানুষ! এ তার নারীত্বের মনুষ্যত্ব চাওয়া নয়। মানুষ বলেই মনুষ্যত্ব দাবী করা। সে মেয়ে না পুরুষ সেটা বড় কথা নয়, সে মানুষ। মেয়েলি সমস্যা তার আসল সমস্যা নয়, তার একেবারে গোড়ার সমস্যা। বঞ্চিতদের অধিকার নিয়ে অনেক মেয়ে লড়াই করেছে, এখনো করছে। কিন্তু ওই বয়সের ওরকম একটি সাধারণ মেয়ের কাছে এই দাবী ছাড়া আর সব কিছু তুচ্ছ হয়ে যাওয়া সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার। তোমার কাছে যা নারীত্বের মর্য্যাদা, মানুষের মত বাঁচার জন্য ও মেয়েটি তা অনায়াসে চুলোয় দিতে পারে। আবার দরকার হলে সেজন্য অনায়াসে গুলির সামনে বুক পেতেও দিতে পারে।

: তুমি কি করে জানলে?

: সত্য জানা যায়।

মানসী আচমকা উঠে দাঁড়ায়।

: কালপরশু তোমার কথার জবাব দেব।

লক্ষ্মীদের বাড়ী থেকে ডেকে পাঠিয়েছিল।

বিকালে হাঁটতে হাঁটতে তাদের বাড়ী যাবার সময় পথের ধারে সেই কলোনির গায়ে সেই মেয়েটিকে দেখতে পাই। আজ সে কলসীতে জল ভরছে না। পরণের শাড়ীখানাও তার ছেঁড়া নয়, নতুন এবং দামী। একা বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

রাস্তার এ পাশে মহিমের পান বিড়ির দোকানের সামনে বেঞ্চটায় পা তুলে উবু হয়ে বসে কলোনির গেঞ্জিপরা সতীশ বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বলে, নব কবি যে! শোন, শোন।

কাছে গেলে বাসের জন্য দাঁড়ানো মেয়েটির দিকে চেয়ে একটু হেসে বলে, একটা হিল্লে হয়েছে মেয়েটার! একটা গান শেখাবার চাকরী পেয়েছে। মস্ত বড়লোকের বাড়ী।

: ভালই তো!

: ভালো বৈকি। গান না জানলেও মেয়েদেব বেশ গান শেখাবার কাজ জুটে যায়। আমাদের পোড়া কপাল আর খোলে না!

সতীশ সবে বিড়ি বানানোর কাজ শিখছে। এখনো একটানা বানাতে পারে না। শ'খানেক বানিয়ে বেঞ্চটায় এভাবে উবু হয়ে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে দু'চার মিনিট বিশ্রাম করে নেয়।

হাঁটতে হাঁটতে সতীশের কথা ভাবি। গায়ের জ্বালাটা

তার একার নয়, নালিশটা মেয়েটির বিরুদ্ধে নয়। বড়লোকের বাড়ী মেয়েটির কাজ জুটেছে এতো একটা রূঢ় বাস্তব সত্যের এ-পিঠ মাত্র। এ সত্যের ওপিঠও আছে এবং সতীশদের সেটা অজানা নয়।

যে কারণে তাদের পোড়া কপাল আর খোলে না সেই কারণেই মেয়েটিকে এভাবে কাজ জুটিয়ে নিতে হয়! সতীশদের যদি বিড়ি বানানো শিখতে না হত, মেয়েটিরও এরকম কাজ জুটে যাবার সুযোগটা আঁকড়ে ধরার প্রয়োজন হত না।

হয় তো ওই সতীশের অন্তঃপুরেই সে অন্য বেশে হাসি মুখে অন্য কাজ করত— তার নিজের সংসারের কাজ।

হারাণবাবুর বাড়ী পৌঁছে সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অবনীর সঙ্গে মেয়েটিকে কথা বলতে দেখে বুঝতে পারি এই বাড়ীতেই আমার পূর্বতন ছাত্রী লক্ষ্মীকে গান শেখাবার কাজ সে পেয়েছে। কাজ পেয়েছে বলেই এতটুকু পথ সে এসেছে বাসে এবং আমার চেয়ে আগে এসে পৌঁচেছে।

অবনীকে প্রশ্ন করি: আমায় ডেকেছেন কেন?

অবনী বলে, আমি জানি না।

অগত্যা ভেতরে একটা খবর পাঠিয়ে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করি।

শুনি মেয়েটি অবনীকে বলছে, আমার গানের বিদ্যা সামান্য। বাড়ীর মেয়েরা দু'দিনে টের পেয়ে গেছেন।

অবনী বলে, টের পাক। সারেগামা শেখাতে ওস্তাদ হতে হয় না।

: আপনার বোন মোটেই খুশী নন।

: আমার বোন আপনাকে রাখে নি তমাল দেবী!

: তবে আর কথা কি!

: নিশ্চয়! আপনার ফাইন গলা। একটু গান শিখলে রেডিও সিনেমায় আপনার কত রোজগার হতো।

ভিতরে আমার ডাক আসে। ডাকতে আসে লক্ষ্মী স্বয়ং— এই সময়ের মধ্যেই সে আরও বেশ খানিকটা বড় হয়ে গেছে বোঝা যায়। একেই বোধ হয় বলে কলাগাছের বাড়!

আমায় দেখে লক্ষ্মী এক গাল হাসে। ভেতরে যেতে যেতে জানিয়ে রাখে, আপনার জন্য মন কেমন করছিল!

আমিও তার দরদের সামান্য চাহিদা মেটাতে অকৃপণের মতো বলি, আমারও খালি খালি তোমার কথা মনে পড়েছে।

শুনে সকাল বেলার তাজা রোদের মতো হাসি ফোটে লক্ষ্মীর মুখে।

রমা বলে, বসুন। ভাল তো সব? সকালে এলে ভালো করতেন, বাবার সঙ্গে দেখা হতো। যাকগে, আসল কথাটা আমি বললেও হবে।

: আপনিই বলুন।

: কোথাও কাজ করছেন?

: না।

: এখানে কাজ করবেন ? আপনার কাছে পড়ার জন্য বজ্জাত দুটো ওৎ পেতে আছে। আপনাকে অবশ্য আমাদেরও খুব পছন্দ হয়েছিল। আমি গিয়েছিলাম মামা-বাড়ী, ক'দিন হল এসেছি। এসে দেখি এ দুটো আরও গোল্লায় গেছে। মাস্টার যে আছে তাকে কেয়ারও করে না।

: আমাকে করবে কি ?

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বলে, করব ! নিশ্চয় করব। যা বলবেন শুনব।

রমা হেসে বলে, ওই দেখুন। আপনি কি দিয়ে যে ওদের বশ করলেন! কবিদের বোধহয় কোন স্পেশাল কোয়ালিফিকেশন থাকে ? ভাল কথা, আপনার কবিতার বই বেরিয়েছে ?

: একটি বেরিয়েছে।

আমায় একটা দেবেন ? না, কিনে নেব ?

: নিজের পয়সায় ছেপেছি, কিনে নিলেই ভাল হয়। শেষ হলে আবার ছাপতে হবে তো।

সে আমায় চাকরী দিতে চায়, আমার কবিতা পড়তে তার অসীম আগ্রহ, তবু আমি বিনা মূল্যে তাকে একটি কবিতার বই উপহার দেব না— এতে তার আঘাত লাগবে ধরেই নিয়েছিলেম। মুখ দেখে বুঝতেও পারি আঘাত সে পেয়েছে।

তাই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আঘাতটা একেবারে বাতিল করে দিয়ে সে আমাকে আশ্চর্য করে দেয়।

হেসে বলে, বুঝেছি। ঠিক কথা। কবিতা বিলি করার জিনিষও নয়, উপহার দেওয়ার জিনিষও নয়। আপনি কারুকে বই উপহার দেন নি— দেবেনও না। ঠিক ধরি নি ?

: ঠিক ধরেছেন। তবে কি না কবিতার বই বলে এ নিয়ম নয়।

: তবে ?

: রোজগার করে বইটা ছাপতে হয়েছে।

লক্ষ্মী তমালের কাছে গলা সাধতে যায়। রমা নিজে আমাকে চা আর খাবার এনে দিয়ে লক্ষণকেও ভাগিয়ে দেয়, বলে, যা ভাগ্, খেলা করগে যা। মাস্টারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নি'।

খানিক চুপ করে থেকে বলে, আসলে আমারও মন কেমন করছিল। কবিরা লোক ভাল নয়, নানারকম মায়া জানে !

হেসে বলি, কবিরা ওসব বশীকরণের মায়া জানে না, মায়া মমতাকে মানতে জানে। সবাই বলছে, টাকাই সব, টাকা দিয়েই সব কেনা যায়— শুধু কবি বলছে, না, টাকার চেয়ে প্রাণটা বড়। অন্যেরাও সুযোগ সুবিধামত একথা বলে কিন্তু দায়ে ঠেকলেই উল্টো গায়। কবির ওই এক কথা। মরে গেলেও এ বিশ্বাস সে ছাড়বে না। কবি ভালবাসাকে বড়

করে, মানুষও তাই কবিকে ভালবাসে। আর কোন ম্যাজিক জানা নেই কবির।

: এটা কি সোজা ম্যাজিক হল ? চারিদিকে হীনতা, স্বার্থপরতা, মানুষের বিশ্বাস গুঁড়িয়ে যায় না ? তার মধ্যে স্নেহ মায়া এ সবের পক্ষ নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো কি সহজ কাজ! কবিরা না থাকলে আমরা কবে ভুলে বসে থাকতাম যে ভালবাসাটাসাও আছে মানুষের জীবনে, শুধুই স্বার্থের হিসাব আর পয়সার লেনদেন নয়।

একটু থেমে রমা বলে, কোন কোন আধুনিক কবি নাকি প্রেম ভালবাসা এসব উড়িয়ে দিচ্ছেন ? বলছেন বাস্তবটাই সত্য ?

রমার প্রশ্ন আমায় আশ্চর্য করে দেয়। সে যে এদিক দিয়েও ভাবে এটা কল্পনাও করি নি।

: কোন কোন কবি তাই মনে করে। দুঃখ দারিদ্র্য ব্যর্থতা নোংরামি এসব দিয়ে প্রেম ভালবাসাকে দাবিয়ে দেবার চেষ্টা তো চলেছে বড় স্কেলে— ফাঁকির কারবারটাই সংসারে বেশী। এই অবস্থাটাকেই তারা বাস্তব ভেবে বসে। প্রেম ভালবাসাটাও যে মানুষের জীবনে বাস্তব এটা ভুলে যায়। প্রেম বলতে ধরে নেয় ফাঁকা মিথ্যা রোমান্স।

: খুব দুর্লভ বলে বোধ হয়। কটা মানুষের জীবনে আর—

: প্রেম ? জীবনে আসল বাস্তব প্রেমের ছড়াছড়ি।

দুর্লভ ওই মিথ্যা রোমান্সটা— দুর্লভ কেন, অসম্ভব। জগতে কারো জীবনে ওটা সত্য হয়ে ওঠে নি। ব্যাপারটা কি জানেন? ভাবাবেগ চরমে উঠতে পারে, মানুষকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে দিতে পারে, পাগল করে দিতে পারে। কিন্তু এটা হল মানুষের নিজের ভেতরের ব্যাপার— যার ভেতরে ঘটছে শুধু তারই ব্যাপার। প্রেম এ স্তরে উঠতে পারে, দু'জন মানুষ পাগল হতে পারে পরস্পরের জন্য। কিন্তু ভাববাদী মানুষ তাতেই সন্তুষ্ট নয়। বাস্তব উন্মাদনা নয়, তার রোমান্স চাই— মানুষের রক্তমাংসের দেহ নেই ধরে নিলে ওই উন্মাদনা যে পদার্থ হবে, সেই জিনিষটি চাই।

: কে জানে, এসব বুঝিনে অত!

দিন দুই ভাববার সময় চেয়ে নিয়ে বিদায় গ্রহণ করি। মানুষের সভ্যতা আজ দেউলিয়া হয়ে যেতে বসে নি, এক বিরাট রূপান্তরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে: সাধারণ মধ্যবিত্তের জীবনের সমস্যা তারই প্রতীক। ভাব চিন্তা, আদর্শ, মহত্ত্ব, প্রেম, হাসি আনন্দের পুরাণো খোলসটা খসে যেতে দেখে দুর্ভাবনার সীমা নেই যে, জীবনটাই বুঝি দেউলিয়া হতে বসেছে।

লক্ষ্মী আর লক্ষণকে পড়াবার কাজটা নেব কি না ভেবে ঠিক করার জন্য আমি দু'দিন সময় নিয়েছি, মানসীও দু'দিন

সময় নিয়েছে আমার প্রস্তাবটা বিবেচনা করার জন্য। না ভেবে ঝোঁকের মাথায় কিছু করার সাধ্য আমাদের নেই— প্রাণ যা প্রাণপণে চায়, সেটাও নয়!

লাখপতি হারাণের বাড়ী আরামের চাকরী, মাস গেলে নগদ একশ' টাকা, প্রতিদিন চা আর ক্ষীর ছানা খাঁটি ঘিয়ের খাবার, মাসে কয়েকদিন কয়েকটা উপলক্ষে তুপুর বা রাত্রের রাজসিক ভোজন— আরও যে কত আদর আপ্যায়ন তার হিসেব দেওয়া দায়। রমা আতুরে মেয়ে হারাণের, সে আমাকে চাকরীতে নিতে ব্যাকুল। সাংসারিক খাতে হাজার তুই আড়াই বাঁধা ধরা খরচের সম্পূর্ণ কণ্ট্রোল তার। কলেজের পড়াশোনা বজায় রেখে এ কাজটা করার জন্য কিছুমাত্র চিন্তারও দরকার নেই— শুধু অবসরটুকু দিয়েই কাজটা করা যায়, তাও সম্পূর্ণটা নয়, আংশিক দিলেই চলে। আমারও খেলাধুলা সিনেমা-দেখা আরাম বিলাস আড্ডা দেওয়া ব্যহত করতে চায় না রমা— শুধু যে সময়টুকু আমার জীবনে বাহুল্য সেই সময়টুকু আমার আশাতীত মূল্য দিয়ে কিনতে চায়।

তবু আমি চাকরীটা নেব কি না ভাববার জন্য সময় চেয়ে নিই তু'দিনের।

মানসীর কাছেও আমি কিছুই চাই নি। তার জীবনের এতটুকু এদিক ওদিক না করে চেয়েছি একটু স্নেহ— চিরদিনের জন্য তার কাছে আত্মসমর্পণ করার সর্তে।

তবু মানসীও দু'দিন সময় নিয়েছে ভেবে দেখবার।

মধ্যবিত্তের জীবনে সব ব্যাপারেই যেন আজ এই দ্বিধা আর সংশয়।

কবিতায় পর্যন্ত!

কবির প্রাণটা পর্যন্ত যেন তার নিজের কবিতায় সংক্রামিত হবার প্রয়োজন বিবেচনা করে দেখতে সময় চেয়ে নেয়,— ভেবেচিন্তে হিসাব করে না দেখে কবিতা পর্যন্ত লেখা চলে না আজ!

লেখার পরেও পুনরায় বিবেচনা করার দরকার হয়।

এসপ্লেনেডে সিনেমাটার সামনে ফুটপাতে এই দ্বিধা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। এদিকে সিনেমা হোটেল সাজানো দোকান পেশাদার পোষাকে সহরের সেরা রূপ, ওদিকে বিরাট গড়ের মাঠ, মিথ্যা কলঙ্কের প্রতীক মনুমেণ্টের নীচে হাজার ত্রিশেক জনসমাবেশ।

সমাবেশ আজ সব দিক দিয়ে মানুষের যে অসহ্য অবস্থা তার প্রতিকার চায়।

ওই সভায় আবৃত্তি করার জন্যই নতুন একটি কবিতা লিখে এনেছিলাম— প্রতিকার চাই। যাচ্ছিলাম সভার্ দিকেই। জনসমাবেশের দিকে চোখ পড়ায় এখানে হঠাৎ থেমে গেছি। হঠাৎ দ্বিধা জেগেছে— কবিতাটা কি ঠিক হয়েছে? সভায়

পড়া কি উচিত হবে? প্রতিকারের দাবী ভিক্ষা চাওয়া হয়ে ওঠে নি তো আমার কবিতায়?

এ খটকা না মিটিয়ে, আবার ভালো করে বিবেচনা করে না দেখে, কবিতাটা তো পড়া চলে না!

সুময়ের সঙ্গে মানসীকে সিনেমায় ঢুকতে দেখে আশ্চর্য হই না। তাকেও ভেবে দেখতে হবে বৈ কি— ভেবে দেখার জন্যই সে সময় নিয়েছে।

আমার দিকে চেয়ে মানসী একটু হাসে। সে হাসির মানে: ভয় নেই। এ কিছু নয়।

নিখিল চানাচুরের প্যাকেটটা প্রায় আমার মুখের ওপর তুলে ধরে বলে, নিন্ না, নিন্ না, ঘরে তৈরী ভালো জিনিষ!

পরক্ষণে আমায় চিনতে পেরে বলে, ওঃ, আপনি!

আমি একটু হাসি। নিখিল তবে এই চাকরি করে!

নিখিল বলে, কি চাকরি করি জেনে গেলেন তা হলে!

: দোষের কিছু নেই। অনেকেই করছে।

: দেখুন, চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হবেই। রোজ সারাদিন ফিরি করছি, চেনা লোকের নজর এড়ানো যায় না। বাড়ীতে কথাটা ফাঁস করবেন না, এইটুকু দাবী কিন্তু জানিয়ে রাখছি। আপিসে কাজ করি, না চানাচুর ফিরি করি, আপনার তো কিছু আসে যায় না তাতে! বাড়ীতে যদি খবরটা জানান, রাস্তায় আপনার মাথা ফাটিয়ে জেলে যাব। বুঝলেন?

: আপনাকে তো চিনতে পারছি না ?

: থ্যাঙ্কস্! ধন্যবাদ! জয় হিন্দ!

পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিখিল শান্ত সংযত দৃঢ়স্বরে পথচারীদের বলে, চানাচুর কিনুন, চানাচুর। শিক্ষিত ভদ্রলোকের ঘরে তৈরী চানাচুর— হস্ত দ্বারা পৃষ্ট নয়। শিক্ষিত লোকের সায়েন্টিফিক চানাচুর কিনুন— উদ্বাস্তুকে সাহায্য করুন। ঘরে তৈরী খাঁটি আসল চানাচুর!

কালীঘাটগামী বাসের জানালা থেকে আলেয়া তার দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে আছে দেখতে পাই। এখানে স্ট্যাণ্ড নেই, গাড়ীতে রাস্তা বন্ধ বলে বাসটাকে দাঁড়াতে হয়েছে। রোজ সারাদিন রাস্তায় চানাচুর ফিরি করলে শেষপর্যন্ত আপন-জনের চোখ সত্যই এড়ানো যায় না!

মলয়া নিখিলকে দেখে উত্তেজিত হয়ে কি বলতে যাচ্ছিল, আলেয়া তার মুখে হাত চাপা দেয়।

বাস ছেড়ে দিলে আমার সঙ্গে আলেয়ার চোখোচোখি হয়। সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিখিল চানাচুর ফিরি করে চলে, ওদের দিকে তার নজর পড়ে নি।

সভার দিকে পা বাড়াই। কবিতা না পড়ি, বক্তৃতা তো শোনা যাবে আর নতুন সুরে নতুন ভাষার গান।

দু'চার জন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয় জমায়েতের

প্রান্তে। কথা হয় দু'চারটা। ভিতরে অস্বস্তি ও অস্থিরতা বোধ করেই চলেছি। এই জমাট জনতার দিকে তফাৎ থেকে চেয়ে কবিতাটি পড়া সম্পর্কে সংশয় জাগার সঙ্গে এটা অনুভব করতে আরম্ভ করেছিলাম।

: সবার পিছনে যে নব'দা ?

অধীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার চেয়ে বয়সে ছোট রোগা এই কিশোর কবির শ্রান্ত বিবর্ণ মুখ দেখলেই মনে হয় সারাদিন রোদের মধ্যে বুঝি টো টো করে রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। মুখের তাজা হাসিটা না থাকলে তাকে অসুস্থ মনে হ'ত।

: মাঝে মাঝে পিছনেও থাকতে হয়। শুধু সামনে এগিয়ে থাকলে পিছন পর হয়ে যায়।

অধীর খুশী হয়ে বলে, বাঃ, ফাইন বলেছ নব'দা !

আমাকে তার ভালো লাগে, আমার কথা ভালো লাগে কিন্তু আমার কবিতা তার একেবারে পছন্দ হয় না। আমার যে কবিতাটি চারিদিক থেকে প্রশংসা পেয়েছে সে কবিতা পড়েও সে খুশী হয় নি, উদাসীনের মতো বলেছে, কি আছে এতে ?

এটা চাল নয়। তার আন্তরিকতায় আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে। অন্য কবির কবিতা সম্পর্কে তার সঙ্গে আমার মতের অনেকবার মিল ঘটতে দেখেছি, তাই আমার কবিতা সম্পর্কে প্রায় সকলের সঙ্গে তার মতের তফাৎ আমার কাছে সত্যই আশ্চর্যজনক মনে হয়।

পকেট থেকে নতুন কবিতাটি বার করে তার হাতে দিয়ে বলি, ছাখো তো কেমন হয়েছে ?

ছোট কবিতা, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েই সে মন দিয়ে পড়ে। আমি অপেক্ষা করে থাকি, পড়া শেষ হলে কখন সে ভাসা ভাসা ভাবে মন্তব্য করবে, এই হয়েছে একরকম আর কি !

কিন্তু আজ অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। মুখ তুলে সে আমার দিকে তাকায়, তার ছ'চোখে উদ্দীপনা। বলে, বাঃ, অদ্ভুত ভালো হয়েছে কবিতাটা ! কোথায় দেবেন ?

কে জানে এ কি রহস্য। যেসব কবিতা সম্পর্কে আমার নিজের কোন সংশয় নেই এবং অনেকের কাছে যেগুলি অসাধারণ ভালো কবিতা, সে সব কবিতা পছন্দ হয় নি অধীরের। আর যে কবিতাটি নিয়ে আমার নিজেরই দ্বিধা সংশয়ের অন্ত নেই, সেটি তার অদ্ভুতরকম ভালো লেগে গেল !

: এটা ভালো লাগল কেন ?

: এতে সত্যি প্রাণ আছে।

প্রাণ আছে ? আমার অন্য কবিতায় প্রাণ ছিল না, এটাতে আছে ? সম্প্রতি ভাবোন্মাদনার যে গুরুতর প্রক্রিয়া ঘটে গেছে আমার মধ্যে তারপর এটি আমার প্রথম লেখা কবিতা।

সেজন্যই কি প্রাণের সঞ্চার হয়েছে এই কবিতাটিতে—অধীর যাকে প্রাণ বলে ?

এবং প্রাণ আছে বলেই কি আমার এত দ্বিধা ? কবিতাটি সভায় পড়ার যোগ্য হয়েছে কিনা এই সংশয়ের পীড়ন ?

কিন্তু প্রশ্ন তো শুধু এই একটি কবিতা নিয়ে নয়।

কবি হিসাবে আমাকে তবে বদলে দিয়ে গেছে প্রক্রিয়াটা ? এবার থেকে যা লিখব অধীরের ভালো লাগবে ?

কিন্তু তার তাৎপর্য তো সাংঘাতিক ! তার মানেই তো দাঁড়ায় যে অধীরের ভালো লাগলে আর দশ জনের ভালো লাগবে না : এতদিন যা ঘটেছে এবার তার উল্টোটা ঘটবে !

কবিতাটি তাড়াতাড়ি ছাপিয়ে দিতে হবে। শুনতে হবে দশজনে কি বলে।

অধীর বলে, ক্লাবের একটা মিটিং আছে কাল ছ'টোয়। আসবে ? কবিতাটা শোনাবে ?

: কোথায় হবে ?

: সুময়বাবুর বাড়ী।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলি, যাব।

বাড়ী থেকে বেরোবার ঘণ্টাখানেক আগে ডাকে তৃপ্তির একখানা কার্ড পেয়েছিলাম। খুব সংক্ষিপ্ত চিঠি— নব, পত্র পাঠ আসবে, দরকারী কথা আছে।

চিঠি সে কদাচিৎ লেখে। অনুমান করতে কষ্ট হয় নি যে, ব্যাপার খুব সহজ নয়।

ফেরার পথে দোকান থেকে দু'টি বিশেষ ভাবে তৈরী পান কিনে তাদের বাড়ী গেলাম।

তৃপ্তির বাবা বনমালী মানুষটা খুব শান্ত এবং একরকম বাক্যহীন। বাজার করেন রেশন আনেন আপিস যান, বাড়ী ফিরে চুপচাপ বসে থাকেন। কথা বলতে এত অরুচি আমি খুব কম মানুষের দেখেছি।

কেমন আছেন?— আমার এই জিজ্ঞাসার জবাবে শুধু একটু মাথা হেলালেন, মুখে কিছুই বললেন না।

তৃপ্তির মা কোলের ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছিলেন— এত বয়সে আবার সন্তান হওয়ায় প্রথমে তিনি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিলেন টের পেতাম, কয়েকমাসের মধ্যে সে ভাবটা সম্পূর্ণ কেটে গেছে।

বলেন, এতদিন আস নি যে নব? বাড়ীর সব ভালো তো? সাগর বলছিল তোমার কথা। এসে গিয়েছ ভালই হয়েছে, খবরটা তোমায় জানিয়ে রাখি। মেয়েটার বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেছে। ওরা চাইছিল ফালগুনেই হোক, আমরা বৈশাখে দিন ফেলেছি। ধীরে সুস্থে আয়োজন করে কাজ করাই ভালো।

ছেলে খোঁজা হচ্ছিল বহুকাল থেকেই। খবরটা অপ্রত্যাশিত নয়। শেষ পর্যন্ত একটা লেগেও যায়, এমনি ভাবেই।

: ছেলেটি কেমন?

তৃপ্তির মা আনন্দে প্রায় গদগদ হয়ে বলেন, খাসা ছেলে পেয়েছি বাবা। আমার পিতিমের মতো মেয়ে, পয়সার অভাবে কানা-খোঁড়া কার হাতে সঁপে দিতে হবে ভেবে রাতে ঘুম হতো না। তা ভগবান মুখ তুলেছেন। রাজপুত্তুরের মতো দেখতে, কোন খুঁত নেই। চারশো টাকার চাকরীতে ঢুকেছে, হাজার টাকার গ্রেড না কি বলে তাই হবে। এ ছেলের দিকে কি চাইবার ভরসা হতো আমাদের? না ঠিকমত দাবীদাওয়া করে বসলে সাধ্যে কুলোত? মেয়ে দেখে খুব পছন্দ হয়েছে ছেলের···

মনের আনন্দে তৃপ্তির মা অনর্গল বকে যান। হঠাৎ থেমে বনমালীকে বলেন, ফটোখানা দেখাও না নবকে?

ফটো দেখে বোঝা যায় তিনি বেশী বাড়িয়ে বলেন নি। সাতাশ আটাশ বছর বয়সের অত্যন্ত সুপুরুষ স্বাস্থ্যবান যুবকের ছবি। সেই সঙ্গে অত ভালো চাকরী,— সত্যই এটা অঘটন বলতে হবে।

অবশ্য, তৃপ্তির চেহারার হিসাবটা ধরলে আর খুব বেশী অঘটন বলা যায় না। এরকম সুন্দরী মেয়েও সংসারে গণ্ডা গণ্ডা মেলে না। সবসময় দেখে দেখে তার রূপের হিসাবটা সত্যই আমাদের খেয়াল থাকে না। গরীব কেরানীর মেয়ে।

তৃপ্তির সেই গা-ভাসানো কথা মনে পড়ে— যেমন জুটবে, তাই সই! গরীব কুৎসিৎ বুড়ো বরের জন্যও নিজেকে

সে প্রস্তুত করে রেখেছে। এরকম অসাধারণ ছেলে জুটে যাওয়ায় নিশ্চয় তারও খুশীর সীমা নেই।

রান্নাঘরে সে ভাইবোনদের ভাত দিচ্ছিল। আমায় দেখেই বলে, তোমার আসবার সময়টা বেশ!

আমি পান দু'টি বাড়িয়ে দিই। হাতে নিয়ে সে জানালা দিয়ে পান বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

: পান খাই না।

আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। তৃপ্তির এমন মেজাজ আর কখনো দেখি নি। রাগটা আমার উপর নয় এটা অবশ্য জানা কথাই, ইতিমধ্যে কোন অপরাধ করার সুযোগ আমি পাই নি। কিন্তু এ কিরকম রাগ যে, গায়ের জ্বালায় আমার উপহার দেওয়া পান ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়?

রান্নাঘরের তেলে ধোঁয়ায় চিটচিটে বালবের মিটমিটে লালচে আলোয় তাকে আজ অপরূপ দেখায়। এতখানি মনোযোগ দিয়ে আমি বোধ হয় এ পর্যন্ত কোনদিন তার দিকে তাকিয়ে দেখি নি।

: দাদার ঘরে গিয়ে বোসো। আমি আসছি।

আপিস থেকে ফেরার পথে ছেলে পড়িয়ে সাগরের ফিরতে রাত সাড়ে ন'টা হবে। বোনের ভালো সম্বন্ধ স্থির হয়েছে কিন্তু বোনকে পার করেও যে তার অমানুষিক খাটুনি কমানো চলবে সে ভরসা কম। তার নিজের বৌ সন্তান-সম্ভবা। বাপের বাড়ী গেছে।

কতটুকু ভাড়া বাড়ী, গায়ে গায়ে ঘর। শুনতে পাই পাশের ঘরে তৃপ্তি মাকে বলছে, ওদের কিছু লাগলে দিও।

: ঘুম পাড়াচ্ছি, উঠব কি করে?

: আমি তা জানি না।

: তোর হয়েছে কি বল্ তো?

: কি হবে? আমি তোমাদের বামনী নই।

থমথমে মুখ নিয়ে সে ঘরে আসে। চোখের চাউনি দেখে কল্পনা করাও সম্ভব হয় না যে এই মেয়েটির প্রকৃতি স্বভাবতই অতি ধীর ও শান্ত, দুঃখবেদনা অপমানও সে চিরদিন নম্রভাবে মেনে নেয়।

বিয়ের ব্যাপারে কি কোন ফাঁকি আছে? এমন ফাঁকি যা তৃপ্তির পক্ষে পর্যন্ত মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না? আসল কথা গোপন করে তৃপ্তির মা কি মিথ্যা বিবরণ দিয়েছেন আমাকে?

রাগে আমার রক্তেও যেন হঠাৎ আগুন ধরে যায়। তাই যদি হয়—

: ব্যাপার কি?

: বলছি। তুমি একবার বম্বে যেতে পারবে?

: তেমন যদি দরকার হয় কেন পারব না? কিন্তু কি হয়েছে খুলে বলবে তো আগে?

তৃপ্তি মুখোমুখি বসে একটা নিশ্বাস ছাড়ে।— যত শীগগির পার আমাকে বম্বে নিয়ে যেতে হবে। মামার কাছে

পৌঁছে দিয়ে আসবে। যত তাড়াতাড়ি পার সব ঠিকঠাক করে নাও—। টাকাও তোমাকে যোগাড় করতে হবে।

: আমার সঙ্গে তুমি বম্বে যাবে ? একলা ?

: যাব। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।

কিসের পীড়নে এমন দিশেহারা হয়ে গেছে তৃপ্তি ? যে সন্দেহটা মনে জেগেছিল সেটা আরও দৃঢ় হয় আমার মধ্যে। বুঝতে পারি যে, আসল কথা টেনে আনতে হবে আমাকেই, গুছিয়ে কিছু বলার ক্ষমতা এখন তৃপ্তির নেই। মনের আলোড়নটা চেপে শান্ত থাকতে আমারও রীতিমত লড়াই করতে হয়।

বলি, তোমার মামা কি বলবেন, তোমার মা বাবা সাগরদা কি বলবেন আর লোকে কি বলবে— সে সব কথা পরে তুলছি। হঠাৎ এভাবে বম্বেতে মামার কাছে পালাবে কেন সেটা আগে বুঝিয়ে বল। কারণটা যদি সেরকম হয় সত্যি, তা হলে অবশ্য ওসব ভাবনা তুচ্ছ করতেই হবে। বিয়ে ঠিক হয়েছে বলে ?

তৃপ্তি নীরবে সায় দেয়।

: ছেলে তোমার পছন্দ নয় ?

: না।

: মাসীমা তাহলে বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বললেন আমাকে ? ছেলেটি দেখতে খুব সুন্দর, ভালো চাকরী করে— ফটো দেখলাম কার ?

: মা মিছে বলবেন কেন ? ফটোও ঠিক দেখেছ।

: তবে ?

তৃপ্তি মুখ তুলে সোজা আমার মুখের দিকে তাকায়। তীব্র চাপা গলায় বলে, তবে মানে ? আমার পছন্দ হয় নি, ব্যস্। আমার নিজের পছন্দ অপছন্দ নেই ? একজনের ভালো চেহারা আর ভালো চাকরী থাকলেই পায়ে লুটিয়ে পড়তে হবে ?

সেই তৃপ্তির মুখে এই কথা ! যেমন তেমন একটা যার হলেই চলতো, রাজপুত্রের মতো ছেলে খুঁজে আনার পর তার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে পছন্দ অপছন্দের প্রশ্ন এবং এমন অসাধারণ ভালো পাত্রে তার মন উঠছে না !

: অপছন্দ হলো কেন ?

: জানি না। ভাবলেও আমার দম আটকে আসছে, মাথা ঘুরছে।

: এ ভাবটা হয়তো কেটে যাবে।

তৃপ্তি দৃঢ়স্বরে বলে, না, কেটে যাবে না। আমি মরে গেলেও রাজী হব না।

দ্বিধা সংশয়ের লেশটুকু নেই তৃপ্তির। তার মেজাজ, তার দিশেহারা উতলা ভাব আর সেই সঙ্গে এরকম একটা চরম ও গুরুতর সিদ্ধান্ত একেবারে স্থির করে ফেলা— এর মধ্যে ফাঁকি নেই। সব ঠিক করে ফেলেছে বলে সে একেবারে কথাই আরম্ভ করেছে আমার সঙ্গে বম্বে মামার

কাছে পালিয়ে যাওয়ার! ফলাফল সবই সে মেনে নিতে প্রস্তুত।

আকাশ পাতাল ভাবি। ভেবে কূলকিনারা পাই না। অনুভূতির এক রহস্যময় জগৎ থেকে সবে পাক দিয়ে ফিরে এসেছি মাটির পৃথিবীর বাস্তবতায়। আরেক রহস্যময় জগতের সাড়া যেন অনুভব করি, চেতনার প্রান্ত থেকে যেন হাতছানি দেয় স্বাদ না জানা আনন্দ বেদনা।

অনেক ভেবে বলি, স্পষ্ট করে জানিয়ে দাও না? তুমি তো ছেলেমানুষ নও, তোমার এরকম অনিচ্ছা দেখলে—

তৃপ্তি মুখ বাঁকায়। ভর্ৎসনার চোখে বলে, কি জানাব? তুমি কবি মানুষ, বন্ধু মানুষ, তোমায় জানালাম। মাকে বাবাকে দাদাকে কি বলব? কেনর কি জবাব দেব?

: জবাব কিছু নেই। যুক্তি দিয়ে তর্ক করে বোঝাবার কথা বলি নি। ওঁরা ধরেই নেবেন যে তোমার মাথা বিগড়ে গেছে। অনেক ঝন্‌ঝাট হবে, লাঞ্ছনা সইতে হবে। কিন্তু উপায় কি? চুপচাপ সব সয়ে যাবে। ওদের কাছে কোন কারণ দেখানোর প্রশ্নই ওঠে না। তুমি শুধু গোঁ ধরে থাকবে, জিদ্ ছাড়বে না কিছুতেই। বিয়ে অগত্যা ভেঙ্গে দিতেই হবে।

তৃপ্তি অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

: এটাই তুমি ভালো উপায় মনে করলে?

: তাই তো মনে হচ্ছে। কেন তোমার অমত, কি

বৃত্তান্ত এসব না বুঝলেও এটা যদি ওঁরা বোঝেন মরে গেলেও তুমি রাজী হবে না— বিয়ে ভেঙ্গে না দিয়ে উপায় কি থাকবে ?

তৃপ্তি ঠোঁট কামড়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তাকে হঠাৎ কেমন শান্ত মনে হয়।

কি যেন ভাবতে ভাবতে বলে, তার চেয়ে তোমার সঙ্গে বম্বে পালিয়ে গেলে ভালো হ'ত না ?

হেসে বলি, এভাবে পালাবার মানে বোঝ না ?

: মানে ? আমি তো মানসীর মত বিদুষী নই, কোত্থেকে মানে বুঝব ?

বলতে বলতে তৃপ্তি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে বলে, চা করছি।

আট

সুময়দের বাড়ী চিনতাম না। অধীর ঠিকানা দিয়েছিল। বাড়ীটা খুঁজে বার করে দরোয়ানশোভিত গেট, ঘোড়া-শোভিত আস্তাবল, মার্বেল পাথরের মূর্তি, ফানুষ, দেয়াল ঝাড়, অয়েলপেন্টিং ফরাস প্রভৃতির সঙ্গে বাড়ীর মানুষ, কর্মচারী আর চাকরের পোষাক ও চালচলন মিলিয়ে প্রথমেই মনে হলো এ বাড়ীতে এ যুগের কবি জন্মায় কি করে? সুময় হয় কবি হিসাবে ফাঁকি নতুবা সে তার পরিবার ও পরিবেশের জীবন্ত স্বতস্ফূর্ত বিপ্লব।

ঘর বাড়ী আসবাব পত্রে শুধু নয়, চালচলনেও গত শতাব্দীকে জীইয়ে রাখা হয়েছে। বৈঠকখানায় ডাকা হয়েছে মানসীদের ক্লাবের একটি সাহিত্যের বৈঠক, ফুল পাতা দিয়ে ঘরটি সাজানো হয়েছে যেন এ বাড়ীতে আজ বিয়ে, ছোট ছেলেমেয়েরা চকচকে ঝকঝকে পোষাকে যেন সং সেজেছে, সুময়ের কাকার পোষাকটাই যেন ঘোষণা করছে যে ভদ্রলোক মস্ত সম্ভ্রান্ত জমিদার। তাকে নমস্কার জানিয়ে মৃদু একটু হাসি লাভ করে আগন্তুকদের আসরে বসতে হচ্ছে। তিনিই নাকি আজ সভাপতি।

অন্দরমহল আড়ালে এবং তফাতে। এ বাড়ীর মেয়েরা

রয়েছেন অন্দরে। সাহিত্য বাসরে নিমন্ত্রিতা মেয়েরা সরাসরি আসরে এসেই বসছেন, শুধু এ বাড়ীর সঙ্গে দু'চারজন যাদের ঘনিষ্ঠতা আছে তারা অন্দর হয়ে মেয়েদের সঙ্গে দেখা করে আসরে আসছেন।

আসছি, বলে মানসীও অন্দরমহলে উধাও হয়ে যায়। ফিরে আসে প্রায় আধঘণ্টা পরে।

: নাঃ, কাউকে আনা গেল না।

সভাপতি সুময়ের কাকা প্রসাদ বলেন, আর কিছু নয়, সাহিত্য সভায় কখনো যায় নি তো তাই লজ্জা পাচ্ছে।

সুময় বলে, উঁকি মেরে না দেখে মেয়েদের মধ্যে এসে বসলেই ভালো হতো।

বাইরের লোকের মত নিস্পৃহ উদাস ভঙ্গিতে তাকে মন্তব্য করতে শুনে প্রসাদ তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকান। অনেক নাম করা লোক বাড়ীতে আসছেন— শুধু কি সুময়ের খাতিরে, তার খাতির কিছুই নেই ? তাকে সভাপতি করে, তাকে দিয়ে সকলের অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়ে, সুময় তবে এমন ব্যবহার করে কেন যে, এ বাড়ীর সবই মিছে এ সভার পক্ষে, ঘটনাচক্রে সে এ বাড়ীতে বাস করে তাই শুধু দশজন কবি শিল্পী সাহিত্যিক এখানে জড়ো হয়েছেন ? সে শুধু এই সভার পক্ষে, বাড়ীর সঙ্গে বাড়ীর মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই ?

পরে শুনেছি, সুময়ের বাবা এ সভার ধারে কাছে ভিড়তে

অস্বীকার করেছেন— তিনি অন্দরেই আছেন। প্রসাদও নাকি কবিতা রচনা করেন।

: দাঁড়াও আমি দেখছি।

প্রসাদ উঠে অন্দরে চলে যান।

মানসী বলে, কি দরকার ছিল? আমরা এসেছি মিট করতে—

সুময় বলে, হোক না, হোক না। মিট তো তোমার বাড়ীতেও করতে পারতাম— এখানে মিটিং ডেকেছি কেন?

অটলবাবুকে আসতে দেখে সুময় এগিয়ে যায়।

বলি, বেচারীকে খুব ফাইট করতে হচ্ছে।

মানসী বলে, নিশ্চয়। এ যুগেও যে এরকম ফ্যামিলি থাকে—

অধীর বলে, আপনারা শুধু বাইরেটা দেখছেন। এ অচলায়তন শেষ হয়ে গেছে— এখন মিউজিয়মের জিনিষ। এ সব পুরাণো চালটাই এদের স্রেফ চালবাজি— জেনেশুনে হিসেব করে বজায় রেখে চলেছে। পয়সা আছে, খুশী হলেই রাতারাতি এরা ডিগবাজি খেয়ে ঢের আপটুডেটদের ডিঙ্গিয়ে যাবে। এর বিরুদ্ধে আবার ফাইট কিসের? গোটা সমাজের কুসংস্কার ভাঙ্গতে চাইলে তাকে বরং ফাইট বলা যায়।

হেসে বলি, সে ফাইট তো তুমি করবে। দরকার হলে

আত্মীয়স্বজন বাড়ী-ঘর ছেড়ে দেবে। সুময় তো তা পারছে না, বাড়ীতে ওর একটু প্রেস্টিজ বাড়ানো দরকার। দেখে বুঝতে পার না বাড়ীতে ওর অবস্থা খুব কাহিল? বাড়ীতে মান বাড়াবার ফাইট করতে হচ্ছে সেটা উড়িয়ে দিও না।

মানসী বলে, বাজে কথা বোলো না। বাড়ীর বড় ছেলে, ওর ভাবনা কি?

: বড় ছেলে বলেই তো বেশী ভাবনা, ফ্যামিলিকে অগ্রাহ্য করে এগোবার উপায় নেই। এসব আয়োজন করে বাড়ীর লোককে বোঝাতে হয় যে ও যা করে তা চ্যাংড়ামি নয়, গুরুতর সামাজিক ব্যাপার, বড় বড় লোকের সঙ্গে ওর কারবার।

অধীর মুখ টিপে হাসে, মানসী রাগ করে বলে, ছি ছি, মানুষকে তুমি—

: কেন, তোমার বন্ধুর নিন্দে করি নি তো? ওর সমস্যাটা দেখাচ্ছিলাম।

প্রসাদ ফিরে আসেন। সুময় অটলবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে তিনি সত্যই খুশী হয়েছেন বোঝা যায়। অটলবাবুর নামের দাম তাঁরও অজানা নয়।

খানিকপরে নানা বয়সের একপাল মেয়ে বৌ অন্দর থেকে বেরিয়ে এসে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই উপস্থিত মেয়েদের মধ্যে বসে। এতক্ষণ এ বাড়ীর মানুষদের সম্পর্কে কমবেশী

যে ধারণাটা সবার মনে গড়ে উঠছিল মেয়েরা তার প্রায় কোন চিহ্নই বয়ে আনে না— না শাড়ীতে, গয়নাতে বা প্রসাধনে। মানসীদের সঙ্গে তারা অনায়াসে মিশ খেয়ে যায়!

যথা নিয়মে যথা সময়ে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টা দেড়েক পরে সভার কাজ আরম্ভ হয়। চা খাবারের বিশেষ সমারোহ না থাকলে ঘণ্টাখানেকের বেশী দেরী হ'ত না।

লোক হয়েছে অনেক। ছোটখাট হলের মতো মস্ত ঘর খানা ভরে গেছে।

গান বাজনা গল্প কবিতা বিশিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য— বাঁধা ধরা সাংস্কৃতিক প্রীতিসম্মেলন। সুময়ের সেতার বাজনার পর আমার কবিতা পড়ার ডাক এল। সুময় চমৎকার বাজাতে শিখেছে— এখন শুধু দরকার শিক্ষাটা পার হয়ে স্বকীয়তায় পৌঁছানো।

সেই কবিতাটা শোনালাম।

সভা স্তব্ধ হয়ে থাকে। ইতিপূর্বে গান হোক বাজনা হোক কবিতা পাঠ হোক প্রত্যেকের বেলা হাততালি পড়েছে। আমার কবিতা শোনার পর কোনদিক থেকে টুঁ শব্দটি ওঠে না। সভার আবহাওয়া যেন বদলে গিয়েছে।

এদিক ওদিক তাকাই। চেনা মানুষের মুখের দিকে চেয়ে মুখে মৃদু হাসি ফোটাই।

কেউ কথা কয় না।

মানসীও দু'চোখে গভীর বিস্ময় নিয়ে নীরবে চেয়ে থাকে।

অধীর বলে, কবিতাটি সম্পর্কে কেউ কিছু বলুন না? আমার মনে হয়েছে, কবিতাটির একটা অদ্ভুত গুণ আছে, একেবারে প্রাণের মধ্যে গিয়ে ঘা মারে।

অটলবাবু বলেন, তা নিঃসন্দেহ। তবে বিচার করতে হলে কবিতাটি বোধ হয় আরেকবার পড়া দরকার।

একটি অজানা মেয়ে বলে, নাড়া দেয় খুব। কিন্তু—

চশমাপরা প্রৌঢ় বয়সী সৌম্যদর্শন একজন বলেন, কবিতাটা ঠিক কি ভাবে নিতে হবে বোঝা মুস্কিল। তবে শুনবার সময় মনে হচ্ছিল—

কি মনে হচ্ছিল ভদ্রলোক সেকথাটা আর প্রকাশ করে বলেন না।

সুময় বলে, এসব কবিতা বিচলিত করে কিন্তু—

এমনি অনিশ্চিত কিছু বক্তব্যের মধ্যে আলোচনা শেষ হয়। আরম্ভ হয় আরেকটি গান। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। সভার প্রতিক্রিয়ার একটি মানে সন্দেহাতীত হয়ে গেছে। কবিতার ধরণ বদলে গেছে আমার— অন্ততঃ এই কবিতাটির বেলা তাই ঘটেছে।

আমিও কি বদলেছি?

নানা বয়সের নানা অবস্থার নানা মতের মানুষ এসেছে

সভায়, আবেগের যতখানি ঐক্য ও সমতা স্বভাবতই আছে তাদের মধ্যে অতি সহজে সেখানটা স্পর্শ করে সকলকে বিচলিত করে দিয়েছি। নাড়া দিয়েছি!

কিন্তু কেন ও কিসের এই আবেগ ব্যাকুলতা, একজনের কাছেও তা ধরা পড়ে নি।

গানের কথার মানে না নিয়েও সুর যেমন নাড়া দিতে পারে মানুষকে, ভাবার্থের স্পষ্টতা ও পূর্ণতা ছাড়াও আমার কবিতা তেমনি সকলকে একসঙ্গে অভিভূত করেছে।

শুধু সুর নাড়া দেয়, তার মানে আছে। সে মানে হলো ঐতিহ্য। আগে থেকেই অনুভূতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বাঁধন থাকে সুরের, নইলে তার সাধ্য কি মর্মস্পর্শ করে। আমি কোন ঐতিহ্যের জের টেনেছি আমার কবিতায়? ভাবার্থের সমগ্রতা ছাড়াই যাতে এমন গভীর সাড়া জাগানো সম্ভব হয়েছে?

কে আমার এ প্রশ্নের জবাব দেবে!

: আজ তোমার প্রশ্নের জবাব দেব। আমরা একটু আগেই বেরিয়ে পড়ি চলো।

প্রায় চমকে উঠেছিলাম মানসীর কথা শুনে! আমার মনের কাব্যাত্মক সমস্যা টের পেয়ে প্রশ্নের জবাব দেবে বলছে মনে করেছিলাম। আমার কবিতার কি হয়েছে ভাবতে

গিয়ে একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আমার একটা গুরুতর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার কথা মানসীর।

সভা শেষ হয়ে এসেছে। দু'একজন করে উঠে যেতে আরম্ভ করেছে। আমি সোজাসুজি রাস্তায় বেরিয়ে যাই, কয়েকজনের কাছে বিদায় নিয়ে মানসীর আসতে পাঁচ সাত মিনিট দেরী হয়।

গেটের কাছে আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মানসী বলে, তোমার বুদ্ধি নেই। সুময় আমায় গাড়ীতে তুলে না দিয়ে ছাড়বে? একটা বই আনতে ভেতরে গেছে। রাস্তায় নেমে হাঁটতে সুরু কর— আমি তোমায় তুলে নেব।

তাই সই।

পথে নেমে হাঁটতে থাকি। মানসীর জবাব শুনবার তেমন জোরালো আগ্রহ অনুভব করি না টের পেয়ে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই। ঘুরে ফিরে কেবলি আমার মনে আসছে আমার কবি জীবনের নতুন পরিস্থিতি এবং তার অজানা সম্ভাবনার কথা। কবিতা লেখার মর্ম জেনেছি এত দিনে, বহু হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোলার ক্ষমতা পেয়েছি, কিন্তু সার্থক করার পথ খুঁজে পাচ্ছিনা আমার কবিতাকে।

অর্ধেক সৃষ্টি, অসম্পূর্ণ সৃষ্টি! কেন এমন হলো আর কিসে এর প্রতিকার সে রহস্যের সন্ধান না পেলে কি মানসীর সঙ্গে কথা কয়ে সুখ আছে?

পাশ দিয়ে মানুষ চলে যায়। গ্যাসের আলোয় মুখ

ভালো দেখা যায় না। জীবন কি এদের কাছে এমনি আংশিক সত্য? জীবনের মানে নেই— শুধু আছে নিরর্থক হাসি কান্না আনন্দ বেদনা ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্রোধ ক্ষোভ ঘৃণা ভালবাসার ভাব-তরঙ্গ?

মানসী নিজেই গাড়ী চালিয়ে এসে পাশে থেমে যায়। হঠাৎ ব্রেক কষে অতি কষ্টে অ্যাকসিডেণ্ট বাঁচায় পিছনের আরও বড় আরও নতুন গাড়ীটা।

: তোমাকে বড় বিচলিত মনে হচ্ছে মানসী। তুমি তো এ টাইপের মেয়ে নও!

গাড়ী চলতে স্থুরু করেছিল। মানসী মৃত্বস্বরে বলে, পিছনে গাড়ী আসছে ভাবি নি।

: তাই তো বলছি। অল্পেই যারা এটা ভাবতে ভুলে যায় তুমি সে টাইপের নও। নিশ্চয় তুমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছ।

খানিক চুপ করে থেকে সে হঠাৎ যেন ঝোঁকের মাথায় বলে, তা এ অবস্থায় মেয়েরা একটু নার্ভাস হয়। তোমার কি হয়েছে সত্যি বলবে? আজ এ কি কবিতা পড়লে? এ কিরকম ভাবে পড়লে? দু'তিনবার আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।

রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করি, মানে বুঝেছ?

: মানে? যায়গায় যায়গায় বুঝেছি। সবটার মানে ঠিক ধরতে পারলাম না।

নিশ্বাস ফেলে বলি, পারবেও না। সবটার বোধ হয় কোন মানেই নেই।

: থাকগে কবিতার কথা। আজকাল তোমার কবিতা ধ্যানজ্ঞান হয়েছে।

: নইলে কবি কিসের ?

: কবিও তো মানুষ ? কোনদিকে যাব ?

একথার জবাব আচমকা খুঁজে পেলাম না। মনে হলো, যেদিকেই যাই, যেখানেই যাই বিশেষ কিছুই আসবে যাবে না। সহর ছেড়ে যদি দুজনে চলে যাই গ্রাম মাঠ গাছপালার নির্জনতার দিকে, যদি যাই সহরের আলোকোজ্জ্বল হোটেলে অথবা যদি যাই আমার বা মানসীর ঘরে— কোথাও এই দম-আটকানো চাপ থেকে আমার মুক্তি নেই।

: চল যেদিকে খুশী।

আমার নিস্পৃহ ভাব খেয়াল করেই বোধ হয় একটু এগিয়ে একটা পার্কের পাশে মানসী গাড়ী দাঁড় করায়। বড় রাজপথ হলেও এ পথে গাড়ী ও মানুষ কম চলে— এখন আরও নির্জন হয়ে এসেছে। রাস্তার নিস্তেজ আলো পার্কের বড় বড় গাছের ছায়ায় এখানে আরও স্তিমিত হয়েছে।

ঘুরে বসে মানসী বলে, তুমি কি রাগ করেছ ? স্থময়ের সঙ্গে দেখেছ বলে ?

: পাগল হয়েছ ?

: আমিও তাই ভাবছিলাম— তুমি এজন্যে রাগ করবে! অন্য কোন কারণে ?

: না না, রাগ করব কেন ?

: তবে এরকম গা ছাড়া ভাব কেন তোমার ? বললাম তোমার কথার জবাব দেব, তবু শুনবার একটু উৎসাহ নেই ? তোমার আমার মধ্যে এরকম বোঝাপড়ার অভাব হবে তাতো ভাবি নি!

আমি জোর দিয়ে বলি, বোঝাপড়ার অভাব হবে না, তুমি যদি ইচ্ছে করে ভুল না বোঝ। বড় মুস্কিলে পড়েছি।

: মুস্কিল! কিসের মুস্কিল ?

ধীরে ধীরে তাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি। অল্প আলোয় তার মুখের ভাব দেখতে পাই না বটে কিন্তু খানিক শোনার পরেই সে প্রায় অস্ফুট আর্তনাদ করে দু'হাতে আমার হাত চেপে ধরে, আবার কবিতা নিয়ে!

: সব না শুনলে তো বুঝবে না।

আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ঘুরে বসে সে স্টিয়ারিং ধরে।

বলে, আমি চালাই, তুমি আস্তে আস্তে বল। তোমার ঘরে গিয়ে বসব। আমার মাথা ঘুরছে। আমি আজ শেষ বোঝা বুঝবই, না বুঝে বাড়ী যাব না।

যে কবি নয় সে কি পুরোপুরি বুঝতে পারে নিজের অসম্পূর্ণতার চেতনা জেগেছে অথচ জানা নেই কেন আর কিসের ফাঁক— কবির পক্ষে এটা কি ভয়ানক অবস্থা ? একটি

কবিতা লিখতে কবির মধ্যে কি তোলপাড় হয়, কি ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা দিয়ে কবি সয়ে যায় ছিঁড়ে পড়ার মতো টনটনে আত্মানুভূতি আর কি কঠিন ও তীব্র আনন্দময় তপস্যায় নিজেকে উঠিয়ে নেয় ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতার শেষ সীমানার উর্ধ্বে— এসব যে জানে না সে কি ভালো করে বুঝতে পারে কবি হয়েও কবিতা লিখতে না পারার ভয়ঙ্কর কষ্ট? কবিকে যে ভালবাসে সে হয় তো খানিকটা বুঝতে পারে। এটুকু প্রাণের আত্মীয়তা ছাড়া তো প্রেম হয় না।

এমনি আমার কথার মর্ম গ্রহণের সাধ্য মানসীর থাকার কথা নয়। যদি প্রেম থাকে মানসীর তবে হয় তো বুঝতে পারবে।

যদি সত্যই কবি আমাকে সে ভালোবেসে থাকে!

এইটুকু ভরসা নিয়েই আমি বলে যাই। মানসী নীরবে শুনে যায়— একটি কথাও বলে না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ব্যাখ্যা করে বোঝানোর কথা তো নয়— যার বুঝবার সে অল্পেই বুঝবে। বাড়ী পৌঁছবার খানিক আগেই আমার কথা যায় ফুরিয়ে।

নয়

বারান্দায় চুরুট টানতে টানতে দাদা অসহায়ের মত মানসীর দিকে তাকান। এত রাত্রে আমার সঙ্গে মানসীকে বাড়ীর যার চোখে পড়ত তার মুখেই বোধ হয় এই অসহায় ভাবটা ফুটত।

মানসী বলে, ভাল আছেন ? ওই যে একজনকে আপনি বাবার কাছে পাঠিয়েছিলেন—

: আমার শালা।

: তাঁর চিকিৎসা নিয়ে বাবা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। একদিন সময় করে যাবেন। মানে, তিনি মদ না ছাড়লে চিকিৎসায় কোন ফল হবে না।

: ওঃ!

: একদিন যাবেন। কথা বলে আসবেন।

ঘরে এসে মানসী কুঁজো থেকে জল নিয়ে খায়। তাকে খুব শান্ত ও চিন্তিত মনে হয়। ভাল করে চেয়ে দেখে বুঝবার চেষ্টা করি তার দু'চোখের বিষন্নতার মানে কি।

চোখে চোখ মিলতে সে মৃদু একটু হাসে।

: আমার একটা কথা রাখবে ?

কথাটা সে হাসিমুখেই বলে— কিন্তু প্রায় মায়ের মত তার স্নেহ ব্যাকুলতা আমার কাছে গোপন থাকে না।

: কি কথা ?

: বাবাকে একবার দেখাও।

আমি সত্যই প্রায় চমকে উঠি !

: তোমার বাবাকে দেখাব ? আমার মাথা বিগড়ে যাচ্ছে কিনা ?

মানসী ব্যাকুল হয়ে বলে, না না, ছি। তা বলি নি আমি। তোমার শরীরটা বোধ হয় ভাল নয়। নিজের অজান্তে মানুষের কত রকমের অসুখ হয়, শরীরে কতরকমের কি হয়, তুমি জানো না। আমি ডাক্তারের মেয়ে, আমি জানি। দেখাতে তো কোন দোষ নেই।

আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকি। প্রাণপণে চাপবার চেষ্টা করছে কিন্তু মুখে খেলে যাচ্ছে গভীর দুশ্চিন্তা ও ভয়ের ছায়া। একটা সিগারেট ধরাই। সেটাই শেষ সিগারেট, আর ছিল না। কিনবার পয়সাও ছিল না।

সত্য কথা বলতে কি, মানসী গাড়ীতে আমায় বাড়ী পৌঁছে না দিলে ট্রাম বাসের পয়সা কারো কাছ থেকে ধার করতে হতো।

: তুমি শেষ পর্যন্ত বুঝে নিলে আমার যা হয়েছে সেটা অসুখ ? ডাক্তারি চিকিৎসায় ধরাও পড়বে, সেরেও যাবে ?

: রাগ কোরো না। ওসব কোন কথাই আমি ভাবছি

না। আমার মনে হয়েছে তোমার শরীরটা ভালো নয়। সত্যি বড় ভাবনা হচ্ছে আমার।

ঠোঁট কামড়ে সেই ঠোঁটেই আবার হাসি ফুটিয়ে মানসী বলে, বেশ তো, তোমার কিছু হয় নি, তুমি সুস্থ আছ। সুস্থ মানুষ মাঝে মধ্যে নিজেকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করালে দোষ আছে কিছু? আমার কথাটা রাখবার জন্যই নয় একবার দেখালে আমার বাবাকে।

: বেশ, তোমার কথা রাখব।

মানসী খুশীতে সোজা হয়ে বলে, কাল সকালেই এসো না? চা খাবে আর—

: কাল নয়। মাসখানেক পরে।

মানসী মুষড়ে যায়।

বলি, কেন, তোমার কথা তো আমি উড়িয়ে দিলাম না? এটা যদি অসুখের জন্যই হয়ে থাকে— অসুখটা আরেকটু প্রকট হোক। আমিও বিজ্ঞানের ছাত্র, টাইসের প্র্যাকটিস অব মেডিসিন আগাগোড়া একবার তো পড়েছি। গোড়ায় না টের পাক, রোগ হলে রোগী শেষ পর্যন্ত জানবেই। আমার অসুখটা একটু বাড়ুক— তারপর চিকিৎসা করতে যাব। এতে তোমার আপত্তির কি আছে?

মানসী খোঁপা থেকে একটা সরু তারের কাটা খুলে সেটা টেনে লম্বা করে আঙ্গুলে প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে বলে, কে যে তোমায় কি দিয়ে গড়েছিল তাই ভাবি!

মানসীও অদৃষ্ট মানে!

দরজার একপাট খোলা, একপাট ভেজানো। তারই আড়ালে ভদ্রতা রক্ষা করে বৌদির সঙ্গে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি বলে, দু'চার মিনিটের কথা ছিল। বলেই চলে যেতাম।

: ভেতরে এসো।

বৌদিও আসেন। প্রথমে আমার এবং তারপর মানসী আর তৃপ্তির মুখে একবার নজর বুলিয়ে নেন।

বলেন, সন্ধ্যা থেকে ধন্না দিয়ে বসে আছে। তোমার সঙ্গে নাকি জরুরী দরকার।

তৃপ্তিকে জিজ্ঞেস করলেম, কবির সঙ্গে তোমার কিসের এমন জরুরী দরকার?

বৌদির কাছে জবাব পেলাম, কাল সকালেই হারাণবাবুর বাড়ী টিউশনী না নিলে কাজটা ফসকে যাবে।

তৃপ্তি হেসে বলে, তুমিই তো সব বলে দিলে বৌদি!

বৌদি বলে, তা হলে দেখলে তো আমিই সব বলতে পারতাম? তোমার এত রাত পর্যন্ত ধন্না দিয়ে থাকার কোন দরকার ছিল না? এইবার তোমরা আসল কথা বলাবলি কর, আমি যাই!

এত স্নেহ করার ক্ষমতা নিয়েও এ কুৎসিৎ হীনতা কেন আসে কে জানে। জীবনে যতটুকু কামনা করার সাহস

আছে তার বিশেষ কোন অভাব নেই, তবু। হয় তো ওই একপেশে একঘেয়ে চাওয়া ও পাওয়ার সঙ্কীর্ণ নিয়ম আঁকড়ে থাকতে হয় বলে হৃদয় মনের অসম্পূর্ণতাকে প্রশ্রয় দেবারও প্রয়োজন হয়— উদারতা বিরোধ হয়ে উঠে পীড়ন করে। জীবনের প্রায় সবরকম আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত কত স্ত্রীলোক ছড়িয়ে আছে সংসারে। খানিক পেয়ে তাই এমন দিশেহারা বিশ্রী সংঘাত সৃষ্টি করতে হয় বৌদির মত স্ত্রীলোকদের।

ডেকে বলি, বৌদি বোসো।

বলি, তৃপ্তি, তুমিও বোসো।

মানসী ভয় পেয়ে বলে, আমি তবে যাই ?

: তুমিও বোসো। আরেকবার কবিতাটা শোনো। আমি সকলের মত চাই।

তৃপ্তি মানসীর মুখের দিকে তাকায়। বৌদি দাঁড়িয়ে থেকেই বলেন, আমায় আবার কি শোনাবে কবিতা ?

: বোসোই না দয়া করে! মন দিয়ে একটু শোনো।

মন দিয়েই তারা কবিতা শোনে— না শুনে উপায় কি ? পঙ্গু অর্থহীন হোক— মন টানার গুণ পেয়েছে কবিতাটি।

ব্যাকুলভাবে প্রথমে তৃপ্তিকেই জিজ্ঞাসা করি, কেমন লাগল ?

: কি সব লিখেছো, গায়ে কাঁটা দেয়।

: মানে বুঝেছো তো ?

: অত কবিতা বোঝার বিদ্যে নেই।

বৌদি গুম খেয়ে গিয়েছিলেন, তাকে একটি কথাও বলাতে পারলাম না। তবে এভাবে কিছু বলতে না চাওয়ার মানে বোঝা কঠিন নয়।

মনে হয়, কবিতা শোনাবার পর আমি যেন পর হয়ে গেলাম তাদের। কথাবার্তা চালানো আর যেন সম্ভব নয়। আমার কবিতার দাপটে আড়ালে চাপা পড়ে গেছে আমাদের অন্য সম্পর্কের জটিলতা আর সমস্যা।

মানসী একরকম কিছু না বলেই চলে যায়।

তৃপ্তিও যাওয়ারই ভূমিকা করে বলে, রাত হয়ে গেল।

: বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসব ?

: না, খোকা সঙ্গে আছে।

বৌদি নীরবে ঘর ছেড়ে চলে যান। তৃপ্তি বহুক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করে আছে এটা বোধহয় তার খেয়াল হয়েছে। কিন্তু তৃপ্তি কিছু বলে না। সে যেন বলার কথা খুঁজে পাচ্ছে না!

শেষে বলে, তবে যাই আমি।

: হারাণবাবুর বাড়ী কাজের কথাটা কি বলছিলে ?

: ওঃ, ভুলেই গিয়েছিলেম। লক্ষ্মী এসে খুব ধরাধরি করেছে আমাকে, তোমাকে ওর মাস্টার করে দিতে হবে। আগেরবার আমিই ঠিক করে দিয়েছিলাম তো— ওর ধারণা

আমি বললেই তুমি রাজী হবে। হারাণবাবুর ইচ্ছা নয় তোমাকে রাখেন। লক্ষ্মী বলছিল, কাল নাকি উনি আরেকজনকে লাগিয়ে দেবেন। তবে তুমি যদি সকাল সকাল গিয়ে পড়াতে আরম্ভ করে দাও তাহলে অবশ্য তোমাকেই রাখতে হবে।

তৃপ্তি হাসে, কি আগ্রহ লক্ষ্মীর! কবিরা কি দিয়ে মানুষ বশ করে বল তো?

: যা দিয়ে কবিতা লেখে।

তৃপ্তি স্থির চোখে চেয়ে মাথা নাড়ে, না, কবিরা একধরণের পাগল বলে। নইলে ছাখো না, শুধু কবির বেলা মেয়েরা উপযাজিকা হয়। মেয়েরা জানে তা ছাড়া উপায় নেই। এত বোকা কবিরা যে অনেক সময় প্রায় সোজাসুজি স্পষ্ট করে বললেও বুঝতে পারে না মনের কথাটা।

: বুঝতে পারে। কবিরা আসলে স্বার্থপর নয়। অন্তেরা ওৎ পেতে থাকে, কোনরকমে প্রিয়াকে পেলেই হলো। মেয়েদের তাই মুখ খুলতে হয় না, পুরুষরাই এসে ধন্না দেয়। কবিরা সস্তা সুযোগ চায় না, পেলেও নেয় না। মেয়েদেরও তো ভুল হয়? সাময়িক ঝোঁক আসে? কবিদের সব বুঝতে হয়। নইলে কবি কিসের?

: এত হিসেবী কবিরা? হিসেব কষে, ওজন করে, কষ্টিপাথরে ঘষে—

: তোমাদের তাই মনে হবে কিন্তু কবিদের ওটা স্বভাবধর্ম, সহজে আপনা থেকে হয়। একজন মনে করছে সে খুব ভালবেসেছে, শুধু এটুকুতে কবির মধ্যে সাড়া জাগবে না।

: কিসে জাগবে?

: সত্যি ভালবাসা হলে। সাড়া যে তুলবে, কবিও জানবে যে ভালবাসে, বলে দিতে হবে না। একটি মেয়ে পাগল হয়ে উঠেছে, সেটা কি কবির দোষ? কবিকেও পাগল করা চাই তো।

তৃপ্তি চোখ বড় বড় করে তাকায়।

একজন পাগল হয়ে উঠেছে, সেটাও সত্যি ভালবাসা নয়? কিরকম ভালবাসায় কবিরা সাড়া দেয়? পৃথিবীর ভালবাসা তো? না তার স্বপ্ন-রাজ্যের ভালবাসা? সে ভালবাসা আমদানী হয় জগতে? রক্তমাংসের মানুষ কারবার করে তা নিয়ে?

অপমানে তার বুকে আগুন ধরে গেছে বুঝতে পারা যায়। সেদিন দেখেছিলাম মেজাজ, আজ তার দু'চোখে দেখতে পাই আগুন।

শান্তভাবেই বলি, কেন শোনা কথা বাজে কথা টেনে আনছ! কেন সস্তা মিছে বদনামটা তুলছ কবির! কবি পৃথিবীর ভালবাসা চায়, খাঁটি বাস্তব ভালবাসা। সেই জন্যই পাগল হওয়াটাই তার কাছে ভালবাসা হয় না। একমুখী ঝোঁকটাই ভালবাসা নয়। একমুখী ঝোঁক নিয়ে বুক

ফেটে মরে গেলেও কবি দু'লাইন কবিতা লিখতে পারে না— বাস্তব জীবন যেমন অনেক কিছু মিলিয়ে, ঝোঁকটাও তেমনি সর্বাঙ্গীন হওয়া চাই, সম্পূর্ণ হওয়া চাই। ভালবাসাও তেমনি। ভালবাসা স্বপ্ন, ভালবাসা রক্তমাংসের শরীর, ভালবাসা দশজনের সঙ্গে মেলানো জীবন, ভালবাসা রাগ ভয় ভক্তি ঘৃণা হিংসা মমতা সব কিছু দিয়ে গড়া—

ম্লান বিষণ্ণ মুখে তৃপ্তির অসহায় চোখে চেয়ে থাকার ভঙ্গিটা আমার নিজের কাব্যিক অসহায়তার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে আমিও প্রায় ওর মতই অসহায় হয়ে পড়েছি— কবিতা-রানীর মায়া পেয়েছি, প্রেম পাই নি।

: বোম্বেতে মামার কাছে যাওয়ার মানে কি আমি বুঝি নি ভাবছ! তুমি আমি ঘর ছেড়ে যাব, এটাই তোমার আসল কথা ছিল। তারপর কি হয় দেখা যাবে।

: বুঝেছিলে ?

পাশের দিক থেকে তার গায়ে আলো পড়েছে। সুন্দর মুখখানা নত করায় তার সুন্দর দেহটি এখন চোখে পড়ে। এই অপরূপ দেহের সঙ্গে নিবিড় মিলনের অভাবে নিজের দেহটা আমার তুচ্ছ মূল্যহীন মনে হয়!

: সব বুঝেছিলাম। বোঝা কি শক্ত ছিল? কিন্তু তুমি তো আমায় ভালবাস না।

: বাসি না ? কে বাসে ?

: কেউ না। এখনো কারো ভালবাসা পাই নি।

তৃপ্তি চোখ তুলে তাকায়।

: তোমার ভালবাসা পায় নি কেউ ?

: পেলে তো চুকেই যেত! তার ভালবাসাও আমি পেতাম।

তৃপ্তি এবার একটু হাসে।— একজন ভালবাসলে আরেকজনকে বুঝি ভালবাসতেই হবে? শাস্ত্রে লেখা আছে নাকি ?

আমিও একটু হাসি।— শাস্ত্রের খবর রাখি না। তবে ভালবাসাটাই এমন জিনিষ যে একপেশে হতে পারে না। হয় দুজনে ভালবাসবে— নয় ভালবাসাই হবে না। এ তো খুব সোজা কথা। বাস্তব জগতের সাদাসিধে নিয়ম। ভালবাসা যে জন্মাবে, দু'জনে মিলে তো জন্ম দেবে ?

তৃপ্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, তাহলে আর কথা কি। ভালবাসা চুলোয় যাক, কাজের কথা বলি শোনো। কাল সকালেই লক্ষ্মীদের পড়াতে যেও। কাজটা নিয়ে নাও, কিছু পয়সা জমাও। কখন দরকার হয় বলা যায় না। এটুকু অন্ততঃ কর আমার জন্যে। কেমন, যাবে তো ?

: দেখি।

: দেখি নয়। যাবে।

আমার কথার জবাব দিতে এসেছিল মানসী, সে কথা

না তুলেই সে চলে গেছে। অবশ্য মুখে না বললেও সে কি বলতে চেয়েছিল বুঝতে কষ্ট হয় নি। আমার দেহেমনে কবি হওয়ার প্রক্রিয়ার প্রভাব দেখে ভয় পেয়ে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিতে চায়— তাকে অবলম্বন করে এই মারাত্মক কাব্যাত্মক রোগটা যদি সামলাতে পারি।

দমে গিয়েও শেষ পর্যন্ত তৃপ্তি ছাড়ে নি, কথা স্পষ্ট করে গেছে। কোন বিষয়ে মন স্থির করে ফেললে সহজে সে হাল ছাড়ে না, অল্পে বিচলিত হয় না।

বৌদির প্রশ্ন আসে : এখন খাবে কি? না ভাত ঢাকা থাকবে?

: সবে দশটা বেজেছে। ভাত ঢাকাই থাক।

কিন্তু এখন কি করা যায়? জীবনে আজ প্রথম অনুভব করি আমার কিছু করার নেই। কবিতা লেখা, বই পড়া, ঘুমানো, খোলা ছাতে গিয়ে পায়চারি করা— কোন কাজে মন বসবে না। সব যেন উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন হয়ে গেছে— চুপচাপ বসে ভাবারও কোন মানে হয় না।

বুকটা কেঁপে যায়। আমি তো এরকম নই। আমিত্ব নিয়ে এরকম বিপন্ন হওয়ার কথা তো আমার নয়!

নিজের কবিতাগুলি পড়ব? তাতেই বা কি হবে! নিজে পড়ে মশগুল হওয়ার জন্য তো কবিতা লিখি না আমি!

আলেয়াদের বাড়ী গিয়ে নতুন কবিতাটা শুনিয়ে আসব? দেখে আসব ওদের কি প্রতিক্রিয়া হয়? যদি সন্ধান পেয়ে

যাই কিসের অভাবে আমার এত ভালো কবিতাটি ব্যর্থ হয়েছে,— এর চেয়ে শতগুণ ভালো শতগুণ মর্মস্পর্শী কবিতা লিখলেও ব্যর্থ হবে !

এখনো ওরা শুয়ে পড়ে নি নিশ্চয়। সেটা সম্ভব নয়। ন'টার পর নিখিল বাড়ী ফেরে।

নিখিল বোধ হয় খেয়ে উঠেই বাইরে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল, আমায় দেখে বলে, এত রাত্রে ?

রাস্তায় চানাচুর ফিরি করার সময় তাকে চিনতে অস্বীকার করেছিলাম মনে করে হেসে বলি, আপনাকে তো চিনতে পারছি না।

নিখিলও হাসে। বলে, আর বলেন কেন ভাই, মানুষের যে কত ছেলেমানুষী অভিমান থাকে! আপিসের চাকুরে বাবু— নিজের এ মিথ্যে সম্মানটা বাড়ীতে বজায় রাখতে কত অসুবিধা যে ভোগ করেছি। চানাচুর বেচি জানলে যেন ছোট হয়ে যাব।

: ছোট হয়ে যান নি তো ?

: নাঃ, ওসব চুকেবুকে গেছে। বাড়ীতে জেনে গেছে, বেঁচেছি। বন্ধুর বাড়ী চানাচুর তৈরী করে ফিরি করতাম— এবার থেকে নিজের বাড়ীতেই তৈরী করব। আসুন, ভেতরে আসুন।

ভিতরে বিছানা পাতা হচ্ছিল। আলেয়ার মা বললেন, এসো বাবা।

আলেয়া ছিল রান্নার ঘুপচিটুকুতে, উঠে এসে বলে, এখন তো গদি নেই, বিছানাতেই বসুন।

তার দু'হাতে চানাচুরের গুঁড়ো মশলায় মাখামাখি!

হেসে বলি, একি জুয়াচুরি! নিখিলবাবুর সায়েন্টিফিক হোম মেড চানাচুর নাকি হস্ত দ্বারা পৃষ্ট নহে!

: উনি হাত দিয়েছেন কই?

: তাই তো, ঠিক কথা।

: একটু খাবেন, গরম গরম টাটকা?

: এত রাত্রে লোকে চানাচুর খায়?

: কবি আবার এত হিসেব করে চলে নাকি— কখন কি করতে হয়!

কেউ ভুলতে পারে না, আমি কবি। এরা কেউ আমার কবিতা চোখে দ্যাখে নি, কোনদিন এক লাইন কবিতা শোনে নি। কবিতা সম্পর্কে কোনরকম আগ্রহ আছে কিনা কে জানে— বিধ্বস্ত বিপন্ন জীবন কাব্যশূন্য হয়ে গেছে।

মনে হয়, এতো আমারই অপরাধ। মানুষের সৃষ্টি কুৎসিৎ বাস্তবতার ঘায়ে মানুষ এরা ভাঙ্গনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে বলে কবি আমিও এদের বাতিল করে রেখেছি আমার কবিতার শ্রোতা হবার অযোগ্য বলে। আজ আমি কবিতা শোনাতে এসেছি নিজের প্রয়োজনে— এদের প্রয়োজনে নয়— এদের জীবনে কবিতা এনে দেবার দায়িত্ব তো আমি পালন করি নি!

দুঃখ দৈন্য চরম দুর্দশা আছে বলে কবিতাও শুনবে না ? মানুষের মত বাঁচার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে বলে কবিতা শোনার আনন্দটুকু থেকেও বঞ্চিত করতে হবে ?

: আমার একটা কবিতা শুনবেন আপনারা ?

আলেয়া খুশী হয়ে বলে, শোনান না, শোনান। দাঁড়ান আমি আসছি।

মলয়া উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, শোনান নবদা, শোনান।

নিখিল বলে, আমিও ভাবছিলাম, আপনার কবিতা আর শোনা হলো না। সময়-ই পাই না !

কবিতা পড়া হলে অন্য সকলের মতোই তারাও খানিকক্ষণ স্তব্ধ অভিভূত হয়ে থাকে। তফাৎ যা বুঝতে পারি সেটা সত্যই বিস্ময়কর মনে হয়। গভীরভাবে নাড়া খেয়েছে কিন্তু এরা সন্তুষ্ট হয় নি। এবং অসন্তোষ এরা গোপন রাখে না।

নিখিল বলে, বাঃ, আপনার বেশ হাত।

আলেয়া বলে, আরেকটা শোনান না, আমরা বুঝতে পারি এরকম কবিতা ?

: শোনাব। আরেকদিন শোনাব।

দশ

এ রাত্রিও নিশ্চয় প্রভাত হবে।

বাকী রাত্রিটা প্রভাত হবার আশায় থাকি। আশা ক্রমে ক্রমে দাঁড়ায় ব্যাকুল প্রতীক্ষায়।

কারণ ঘুম আসে না। ঘুমের একটু আবেশ পর্যন্ত নয়!

একটা রাত ঘুমের অভাব ঘটলে কবি অবশ্য কাতর হয় না। এটা তো ইনসোমনিয়া ব্যরামের জন্য নয়— স্বাস্থ্য আর বিবেক দুটিতেই ঘুণ ধরার যেটা লক্ষণ। ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে আর প্রতিভার অজুহাতে কবি আমি অসংযম আর উচ্ছৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দিই নি— সজ্ঞানে সচেতনভাবে বিবেককে বিলিয়ে দিই নি কোন স্বার্থের খাতিরে।

সত্যোপলব্ধির প্রয়োজন অসীম গুরুত্ব পেলে কবি হৃদয়ে যে স্বাভাবিক ব্যাকুলতা জাগে তারই কাছে আজ আমার ঘুমের প্রয়োজন তুচ্ছ হয়ে গিয়ে হার মেনেছে।

আর একজনকে কবিতাটি শোনানো বাকী আছে। শুধু একজনকে। এই কবিতাটি লেখার যে প্রত্যক্ষ কারণ-স্বরূপ, —যাকে প্রত্যক্ষ করে আমার কবি-চেতনা ভাঙতে আর গড়তে সুরু করেছিল শব্দ ও ছন্দের রূপ ধরে এই বিশেষ কবিতাটি হয়ে আত্মপ্রকাশ করার জন্য।

কাল সকালে তমালকে কবিতাটি শোনাতে হবে।

কিছুদিন আগে উদ্বাস্তু কলোনির ধারে রাস্তার কলে জল নিতে এসে দাঁড়িয়ে যে পথচারী বাস-চারী মোটর-চারী সকল মানুষের দিকে তাকিয়েছিল মনুষ্যত্বের সহজ সতেজ দাবী নিয়ে, তার দিকে কে কি ভাবে তাকাচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দিয়ে।

তমাল যদি মানে বোঝে আমার কবিতার, তার যদি ভাল লাগে আমার কবিতাটি—এ জগতে আর কোন ভক্ত বা সমালোচকের সার্টিফিকেট আমার দরকার হবে না।

জানি, এ সিদ্ধান্ত অনেকের মনে প্রশ্ন জাগাবে যে শেষ বিচারের ভার তমালের উপর ছেড়ে দেবার মানে কি? সে না হয় প্রেরণা জুগিয়েছিল একটি কবিতা লেখার, কিন্তু কাব্য-বিচারের বিশেষ কোন ক্ষমতা কি তার আছে?

তার এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোন কথাই তো বলা হয় নি? সাধারণ একটি উদ্বাস্তু মেয়ে হিসাবেই বরং তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আমার কবিতার চরম বিচারের অধিকারিণী হবার মত অসাধারণ গুণ সে পেল কোথায়? সে গুণটাই বা কি?

কথাটা পরিষ্কার করে বলা দরকার। তমালের সঙ্গে আমার পরিচয় সামান্য— আমি লক্ষ্মীদের পড়াতে যাই আর সে গান শেখাতে যায়, এই সূত্রে ভাসা ভাসা ভাবে একটু আলাপ হয়েছে মাত্র। কোন অসাধারণত্ব যদি এই মেয়েটির থেকে থাকে আমি সত্যই তার খোঁজ রাখি নি।

সাধারণ একটি অল্পশিক্ষিতা মেয়ে বলেই তাকে আমি জানি। নিরাশ্রয় নিঃস্ব পরিবারের সাধারণ মেয়ে, অবস্থার কল্পনাতীত পরিবর্তন আজ যাকে অন্তঃপুরের আশ্রয় থেকে কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

যথা নিয়মে ছেলে খুঁজে এনে বিয়ে দেওয়া হলে তাদের মতই আরেকটি পরিবারে ঘর করতে যাওয়ার জন্য সে প্রস্তুত হয়ে ছিল। সেই সাধারণ জীবন ও স্বপ্ন আরও অনেকের মত তারও একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। এই সর্বনাশা পরিবর্তনকে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস বলেই হয় তো সে মনে করে কিন্তু কাজে সে অদৃষ্টের মুখ চেয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে রাজী হয় নি।

তার চেতনায় সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে এই সত্য যে, সেও মানুষ এবং মানুষের মত বাঁচার তার জন্মগত অধিকার। সংসারের কোন নিয়মনীতি আইনকানুন যদি তার এই অধিকারের বিরুদ্ধে যায়, তার এই দাবীকে ব্যহত করে, তবে সেটাই হবে সংসারের সব চেয়ে বড় অন্যায়।

এখন কথা হ'ল, এই চেতনা কি তাকে কোন অসাধারণত্ব দিয়েছে? আমি তা মনে করি না। সচেতন মানুষগুলির কথা বাদ দিলাম, তার মত এমন অনেক সাধারণ মেয়ের মধ্যেই আজ এই চেতনার বিকাশ কমবেশী ঘটেছে।

জগত ও জীবন সম্পর্কে চিন্তা হয় তো আচ্ছন্ন হয়ে আছে অনেক ভ্রান্তি ও সংস্কারে কিন্তু মানুষ হিসাবে নিজের অধিকার

বোধ আজ আর সাধারণ মেয়েদের মধ্যেও দুর্লভ নয়— বিদ্যা-বুদ্ধির যতই তাদের অভাব থাক।

তমালের মধ্যে এই অধিকার বোধ ও সেই অধিকার দাবী করার অভিব্যক্তিটা অত্যন্ত সতেজ অথচ সহজ ও স্বাভাবিক। সে অনর্থক চেঁচামেচি করে না, গায়ের ঝাল ঝাড়ে না, সর্ব্বদা ক্ষুব্ধ বা হতাশ হয়ে থাকে না। এইটুকুই হয় তো তার বৈশিষ্ট্য।

এরকম একটি সাধারণ মেয়ের বিচারই শেষ কথা হবে। কারণ, এরা যদি না বোঝে, এদের যদি নাড়া না দেয়, তবে মিছেই আমার নতুন যুগের কবিতা লেখা।

শুধু বন্ধু মহলে তারিফ পাওয়ার কবিতা লিখে কি হবে?

এটাও একটা ভাববার কথা যে তমাল আমার বন্ধু নয়। হঠাৎ তাকে একটা কবিতা শোনাতে চাওয়ার মত ঘনিষ্ঠতা তার সঙ্গে আমার জন্মে নি।

তবে সেজন্য আটকাবে না। আমি তো ভীরু লাজুক ভাবুক কবি নই! পাঁচ দশ মিনিট আলাপ করে কবিতা শোনাতে চাওয়াটা স্বাভাবিক ও সঙ্গত করে তোলার মত অবস্থা নিশ্চয় সৃষ্টি করতে পারব!

এ সিদ্ধান্তে যখন পৌঁছলাম, মাঝরাত্রি পার হয়ে গেছে। কয়েকটা কুকুর প্রচণ্ড সোরগোল জুড়েছিল বাড়ীর সামনে

রাস্তায়। মারামারি কামড়াকামড়ির চীৎকার আর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। ঘরের সামনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আকাশে প্রায় আস্ত একটা চাঁদ। ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘভরা আকাশ আর ইট কংক্রীট খোলার ঘর ভরা সহর জুড়ে নয়ন মন ভুলানো অপরূপ শোভা সৃষ্টি করেছে, আবার রাস্তার ওই কুকুরগুলির উপরেও অকাতরে জ্যোৎস্না ঢেলে যাচ্ছে।

আমি মানুষ। চাঁদিনী রাতের শোভা দেখতে পাওয়ার ভাগ্য কেবল আমারই। এমন ভাগ্যবান তবু কেন এত বিড়ম্বনা?

সকালে নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই লক্ষ্মীদের পড়াতে যাই। আমার কাছে পড়ার আগে তারা তমালের কাছে গলা সাধে।

বাইরে থেকে শুনতে পাই তমালের সুন্দর গলা। রবীন্দ্র-নাথের একটি গানের অংশ একটু বেসুরা সুরে গেয়ে ছাত্রীদের শেখাচ্ছে।

রমা বলে, আজ এত তাড়াতাড়ি যে?

: বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম।

: একটু অপেক্ষা করতে হবে। ওরা গলা সাধছে।

: গান শেখানোই শুনি একটু বসে বসে।

: ছাই শেখাচ্ছে। নিজেই ভাল জানে না শেখাবে কি? দাদার যে কি বুদ্ধি-বিবেচনা! বলে কি না, পেশাদার

গাদা গাদা কবিতা লিখছে কি করে? তবে ভাল কবি হতে গেলে কবির ধাতটা থাকা চাই— বিশেষ কতগুলি গুণ থাকা চাই। শুধু কবিতার বেলায় নয়, সব ব্যাপারেই ওই এক নিয়ম। চেষ্টা করলে সকলেই গান শিখতে পারে, কিন্তু বিশেষ গুণ ছাড়া কি উঁচুদরের গায়ক হতে পারে কেউ?

তমাল হেসে বলে, যেমন আমি পারি নি।

রমা তার কথা কানে না তুলেই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, ওকেই তো প্রতিভা বলে, ওই বিশেষ গুণ?

অতি সাধারণ সব কথা কিন্তু যেরকম আগ্রহের সঙ্গে তারা শোনে তাতে সত্যই আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। এই কৌতূহলের আরেক অর্থ প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা!

আমি বলি, যে লাইনে যে বিশেষজ্ঞ তার বিশেষ গুণকেই প্রতিভা বলে। কিন্তু প্রতিভা সম্পর্কে মানুষের অনেক ভুল ধারণা আছে। প্রতিভা কোন আকাশ থেকে পড়া গুণ কিম্বা ছাঁকা কোন গুণ নয়। অনেক কিছু জড়িয়ে এই গুণ— কোন বিষয়ে সাধনা করার বিশেষ ক্ষমতা আর আগ্রহই আসল কথা। বৈজ্ঞানিক আর কবির প্রতিভা আসলে এক— দু'জনের মধ্যে তফাৎ শুধু ঝোঁকের। মনের গড়ণ, পরিবেশ, সুযোগ সুবিধা অনেক কিছু মিলে ঝোঁকটা ঠিক করে।

বক্তব্যটা ওরা কেউ বুঝতে পারে নি টের পেয়ে সোজা কথায় চলে আসি, বলি, বৈজ্ঞানিকও সাধক, কবিও সাধক। দু'জনের দু'রকম সাধনা। দু'জনকেই সাধনার

স্তর পার হয়ে এগোতে হয়। আমি যে নতুন কবিতাটা লিখেছি, কয়েকটা স্তর পার হয়ে না এলে কিছুতেই এটা লিখতে পারতাম না।

তমাল বলে, আপনি কবিতা লেখেন ?

রমা বলে, নতুন কবিতা ? শুনেছি ?

: না। শুনতে চাইলে শোনাতে পারি। সঙ্গেই আছে।

তমাল চুপ করে থাকে। রমা সাগ্রহে বলে, শুনি না, শুনি।

কবিতা শুনতে, বিশেষতঃ অজানা তরুণ কবির কবিতা শুনতে, তমালের আগ্রহের অভাব আমাকে বিস্মিতও করে না, আহতও করে না। আগ্রহের অভাবটাই তার পক্ষে সঙ্গত এবং স্বাভাবিক।

তবে কবিতাটি সে শোনে। মন দিয়েই শোনে।

শুনতে শুনতে তার মুখের যে ভাব হয় আমায় তা হতাশ করে দেয়। প্রতিভা সম্পর্কে আমার কথাগুলি বুঝতে না পেরে যেভাবে সে তাকিয়ে ছিল, কবিতা শুনতে শুনতেও প্রায় অবিকল সেই ভাবেই তাকিয়ে থাকে। এবার কেবল বুঝবার জন্য আরও বেশী মন দিয়ে শুনবার চেষ্টায় বাড়তি একটা ব্যাকুলতার ছাপ পড়ে তার মুখে।

নীরবে আমার কবিতার বিচার করে মুখের ভঙ্গিতেই সে রায় দিয়েছে!

কবিতা পড়া শেষ হবার পর ধীরে ধীরে তার মুখে প্রায় নির্বিকার উদাসীনতা ফিরে আসে।

রমাও ঝিমিয়ে গিয়ে বলে, এ কিরকম কবিতা ? এমন ব্যাকুল করে দেয় মনটাকে !

তার কাছে এরকম মন্তব্যই প্রত্যাশা করেছিলাম।

কবিতা সে বোঝে নি। বুঝবার জন্য নিজের অসীম ব্যাকুলতাকে সে ধরে নিয়েছে কবিতাটির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বলে! নিজেই সে নিজের মধ্যে সৃষ্টি করেছে সে আবেগের আলোড়ন, কবির জন্য তার মোহগ্রস্ত উদ্বেল হৃদয়ে যেটা অনায়াসেই সম্ভব হয়েছে, সেটাকেই সে মনে করেছে কবিতা শোনার ফল !

শুধু রমা নয়। আরও অনেককেই আমি জানি, কবিকে নিয়ে মেতে গিয়ে যাদের একরকম মত্ততা আসে, কবিতা বোঝা না বোঝার প্রশ্ন যাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়, বিশেষ কবিটির সৃষ্টি বলেই বুঝুক না বুঝুক তার কবিতা তাদের হৃদয়মন আলোড়িত করে।

একটা কাজ করতে করতে অন্যমনস্ক হওয়া আমার ধাতে নেই। যতই জরুরী আর বাস্তব হোক চিন্তা বা দুশ্চিন্তা, হাতের নগদ কাজের দায়িত্ব ভুলে গিয়ে তাতে মশগুল হওয়া আকাশের কুসুম নিয়ে মেতে থাকার চেয়ে খারাপ।

পাড়তে পড়াতে আজই বোধ হয় প্রথম আমি ভুলে যাই যে একটা কাজ করছি, লক্ষ্মীদের পড়াচ্ছি। লক্ষ্মীর প্রশ্নে চেতনা আসে।

: কি ভাবছেন ?

জবাব না পেয়ে আবার মৃদুস্বরে বলে, আপনার মনটা ভালো নেই, না ?

: মন ভালো না থাকা কাকে বলে তুমি বোঝ লক্ষ্মী ?

: বাঃ, কেন বুঝব না ? এ বোঝা কঠিন নাকি! কিন্তু আপনার কেন মনে কষ্ট হবে ?

: আমার মনে কষ্ট হতে নেই ?

: না। আপনি যা নিষ্ঠুর!

লক্ষ্মীর বড় হবার উদ্দাম প্রক্রিয়াটা সমান ভাবেই চলছে, তবে অনেকটা সংযত হয়েছে তার প্রকৃতি। একটা নাটকীয় খণ্ড দৃশ্য সৃষ্টি না করেই সে আমাকে মুখের উপর নিষ্ঠুর বলতে পারে।

: তোমাকে একদিনও শাসন করি নি লক্ষ্মী!

: শাসন না করলে কি হয় ? শুধু পড়াতে আসেন, পড়িয়ে চলে যান।

নালিশ ও অভিমানে তার থমথমে মুখের দিকে একটু শঙ্কিত দৃষ্টিতেই চেয়ে থাকি। লক্ষ্মীও ব্যথা পেয়েছে আমার নীরস ব্যবহারে ?

জোর করে বলি, তুমি আমার আদরের ছাত্রী।

লক্ষ্মীর চোখ ছুটি সজল হয়ে ওঠে।

: আদর ছাড়াই আদরের ছাত্রী!

লক্ষ্মী আজ আমায় বিব্রত করে, কিশোরী ছাত্রীটির কাছে অস্বস্তি বোধ করি। কোথায় যে ক্রুটি ঘটেছে আমার ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, কিন্তু একথাও ভাবতে হয় যে আঘাত না পেলে সরল তাজা মনটা তার ব্যথাই বা পাবে কেন?

আমি কী প্রত্যাশা জাগিয়েছি তার মধ্যে, যা আমি পূরণ করি নি? কোন্ পাওনা থেকে তাকে বঞ্চিত করে, তার কোন্ সঙ্গত দাবী ফাঁকি দিয়ে আমি নিষ্ঠুর হয়েছি?

কোনরকমে পড়ানো শেষ করে পথে নেমে যাই।

কলোনির সামনে রাস্তার কলে তখনও কয়েকজন জলার্থী ও জলার্থিনী অপেক্ষা করছিল। তাদের পাশ কাটিয়ে কলোনিতে ঢুকে পড়ি। তমালের সঙ্গে কথা বলব।

তমালের বিচার জেনেছি, আমার কবিতা তাকে নাড়া দিতে পারে নি। আরেকবার বিচার করে সে তার রায় পাল্টে দিতে পারে, এ আশা রাখি না। তমালের সঙ্গে কথা বলতে চাওয়ার উদ্দেশ্যও তা নয়।

তার মনের ভাবটা আরেকটু খুঁটিয়ে জানতে চাই।

সতীশদের ঘর জানতাম। তমালদের কুটিরখানা ঠিক তারই সামনাসামনি।

চাঁচের বেড়া ও খড়ের চালার একটি প্রমানসাইজ ও একটি খুব ছোট ঘর। চালে খড়ের পরিমাণ খুবই কম। বর্ষাকালে জল পড়ে কিনা কে জানে!

ছোট ঘরটিতে তমাল রান্না করছিল। তাকে খবর দেবার প্রয়োজন হয় না, আমাকে দেখতে পেয়ে সে নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

তারই মত জিজ্ঞাসু চোখ নিয়ে ঘিরে আসে একগণ্ডা ছোটবড় ছেলেমেয়ে।

তমাল জিজ্ঞাসা করে, কি বলছেন?

আমি ইতস্ততঃ করে বলি, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব ভাবছিলাম। কিন্তু আপনি ত দেখছি রাঁধছেন—

দ্বিধাভরা দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত আমাকে লক্ষ্য করে তমাল বলে, ভাত চাপিয়েছি, ফুটতে এক ঘণ্টা। আসুন, ঘরে এসে বসুন।

সাধারণ গেরস্তালির জিনিষপত্রে ঘরটি ভরা— কিন্তু যতদূর সম্ভব সাজানো গোছানো। একপাশে চৌকীর বিছানায় বসেছিলেন রুগ্ন এক বৃদ্ধ।

তমাল বলে, ইনি আমার বাবা। মা নাইতে গেছেন।

মাদুর বিছানোই ছিল, তাতে সে আমায় বসতে দেয়। নিজেও একটু তফাতে বসে!

আমি বলি, আমি যা বলতে এসেছি শুনলে আপনার ভারি মজা লাগবে।

সে বলে, তা হলে তো ভালই। আমি ভাবছিলাম কোন খারাপ খবর আনলেন না কি!

: চাকরী সম্পর্কে?

: তা ছাড়া কি? কবে তাড়িয়ে দেয় অপেক্ষায় আছি।

: রোজগার করার আর কেউ নেই?

: একটা ভাই ছিল, মারা গেছে। কি বলছিলেন আপনি?

: আমার কবিতাটা শুনে কিরকম লাগল কিছুই বলেন নি। আপনার মতামত জানতে এসেছি।

বিব্রত বোধ করলেও বিনয়ের ছলে সে কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে না। আমি ভারি কবিতা বুঝি, আমি আবার একটা মানুষ, আমার আবার মতামত— এ ধরণের কোন কথাই বলে না।

কবিতাটি সম্পর্কে মতামত দেবার অধিকার তার পূরা-মাত্রাই আছে, মনের কথাটা কিভাবে প্রকাশ করবে তাই সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

: আরেকবার শোনাবেন?

পড়ে শোনাই। বুঝবার জন্য মন দিয়ে শুনবার চেষ্টার সেই ভঙ্গিটাই আবার তার মুখে দেখা যায়।

পড়া হলে বুড়ো মানুষটি বলেন, কিসের ছড়া?

তমাল বলে, ছড়া নয়, ওনার লেখা কবিতা।

জিজ্ঞাসা করি, কেমন লাগল?

সে বিব্রতভাবে হাসবার চেষ্টা করে মাথা নাড়ে।

বলি, ভালো লাগে নি। বুঝতে পেরেছেন কি বলছি ?

: না, ঠিক বুঝতে পারি নি। একটা কথা বলতে বলতে আবার কি যেন আরেকটা কথা বলছেন মনে হলো।

: সেইজন্য খারাপ লেগেছে ?

: তাছাড়াও কেমন নীরস লাগল— কিরকম যেন শুকনো খটমট কবিতাটা। রাগ করবেন না কিন্তু, আমার কেমন লেগেছে শুনতে চাইলেন, তাই বললাম।

: বেশ করেছেন, বানিয়ে মন-রাখা কথা বললে রাগ করতাম। এক কাপ চা খাইয়ে বিদায় দিন।

সে চা করতে যায়। আমি তার বুড়ো বাপের সঙ্গে কথাবার্তা বলি। কথায় কথায় তিনি জিজ্ঞাসা করেন, সতীশরে জানো, সতীশ ?

: জানি।

: ওর একটা চাকরী বাকরী হয় না ?

: কি বলব বলুন ? যে দিনকাল।

ভাঙা কাপের চা খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়েছে, বাইরে স্বয়ং সতীশের গলা শোনা যায়, বাজারটা নাও দিকি।

শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে বাইরে যাই। তমালের হাতে বাজারের থলিটা দিয়ে সতীশ বলে, আপনি এখানে ?

: এঁকে একটা কবিতা শোনাচ্ছিলাম।

: আমরা বাদ গেলাম কেন?

বলে সতীশ হাসি মুখেই তমালের দিকে তাকায়।

: আপনাকেও শোনাবো বৈ কি!

: দোকানে আসুন, সেখানে বসে শুনব।

সতীশের সঙ্গে মহিমের বিড়ির দোকানে যাই। জন সাতেক বিড়ি পাকাচ্ছিল, সতীশ তাদের মধ্যে নিজের যায়গায় বসে পড়ে।

মহিম বলে, সকাল বেলা যে নববাবু?

: তোমাদের একটা কবিতা শোনাতে এলাম ভাই।

: আরে, কবিতা শোনাবেন! আপনার কবিতা?

: কবিতা কি বুঝব?

: কিসের কবিতা লিখেছেন? মোদের লিয়ে?

হেসে বলি, শোনই না। শুনে কেমন লাগে বলবে ভাই।

একটু দুলে দুলে বিড়ি পাকাতে পাকাতেই তারা কবিতা শুনতে আরম্ভ করে। তারপর হাতের কাজ বন্ধ হয়ে আসে তাদের, মুখ তুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

তারাও অভিভূত হয়। তবু, তারাও জানায়, ঠিক বুঝতে পারে নি আমার কবিতা।

রাস্তাতেই কবিতাটা ছিঁড়ে ফেলে দিই। আর কাউকে শোনাবার দরকার নেই। শত শত বছর ধরে জীবনের সঙ্গে ধারাবাহিক যে কাব্যবোধ সকলে পেয়েছে বিচিত্র জীবন-চেতনার সাথে, আমার কবিতায় সেই বোধকে নাড়া দিয়েছি। কিন্তু এদের প্রাণের ভাষা জানি না বলে বোধগম্য মানে দিতে পারি নি।

এগার

: পড়া ছেড়ে দিলে ঠাকুরপো ?

: দিলাম।

: এত সময় শক্তি পয়সা খরচ করলে, আরেকটু ধৈর্য ধরলেই চুকে যেত। পুরো বছরও নয়।

: নিজের পেশাটা ধাতে আনি ? এমনিই বড় দেরী হয়ে গেছে।

: তুমিই বলেছিলে কবিদের খামখেয়ালী হওয়ার মানে হয় না।

: আজও তাই বলি। এটা আমার খেয়াল নয়, কর্তব্য দাঁড়িয়ে গেছে। এতদিন দরকার হয় নি, পড়াও ছাড়ি নি। কিন্তু এখন ওদিক বজায় রাখতে গেলে আমার আসল কাজ নষ্ট হয়। কোটি কোটি মানুষ আমার মুখ চেয়ে আছে বৌদি, আমি তাদের কবি হব। দেশ বিদেশ আমার কথা শোনার জন্য কান খাড়া করে আছে। সর্বদা কি মনে হচ্ছে জান ? সবাই যেন বলছে, তোমার কতবড় কাজ আর তুমি কি ছেলেমানুষী করে সময় নষ্ট করছ ? এসব মিথ্যে পাগলামি বলে উড়িয়ে দিতে পারব না, কি করি বল ? এ অবস্থায় আর ঢিল দেওয়া সম্ভব নয়।

বৌদির মুখ কালো হয়েই থাকে।

: কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াও?

: সব জায়গাতেই যাই। গ্রামে বাজারে বস্তিতে মন্দিরে মসজিদে হোটেলে সিনেমায় বন্ধুর বাড়ী আত্মীয়ের বাড়ী সভায়— কাল হাওড়ায় তোমার দাদার বাসায় গিয়েছিলাম। উনি একটু ভাল আছেন।

: দু'মাসে যে চেহারা কালি মেরে গেল?

: যাক না। চর্বি জমেছিল, ক্ষয় হোক।

: কিন্তু এদিকে তো জমিদারী নেই। কি ক্ষয় হবে?

: ভেবো না, আমি ভাবুক কবি নই। সে ব্যবস্থা হবে।

মানসী বলে, বাঃ, বেশ তো! মাইকেল নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ নজরুল সুকান্ত দাশুরায় নেরুদা······সবাইকে বিছানায় ছড়িয়েছো? মেশাচ্ছো নাকি?

: মেলাচ্ছি।

: কবি-শিল্পের পরীক্ষা করবে?

: পরীক্ষা চলছে। রোজ ফেল করছি।

: মানেটা কি?

: মানে খুব সোজা। তোমায় তো আগেই বলেছি যে ভাষা খুঁজছি— বাস্তব জীবনের প্রাণের ভাষা। আমার ভাব নতুন, নতুন যুগের নতুন সত্যকে আমি জেনেছি— কিন্তু

কবিতায় কোন ভাষায় ঢেলে সাজব? ভাব রাখতে গেলে কবিতা হয় না— যেন একটা প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার তৈরী করেছি। কবিতা করতে গেলে ভাব থাকে না— যেন কাব্য-বোধের ঐতিহ্যটুকু শুধু গুলে দিয়েছি। আমার না হয় বস্তুবাদী জীবনদর্শন— অন্য জীবনদর্শনও তো কম কঠিন বা কম জটিল নয়। কিন্তু কবিতার তাতে এসে যায় নি। ঈশ্বরবাদ, মায়াবাদ, ভক্তিবাদ, রহস্যবাদ— এসব বাদ না দিয়েও কতশ' বছর ধরে জগতে কত কবিতা লেখা হয়েছে। নিজস্ব ভাবও বজায় আছে, কবিতাও হয়েছে। আমার একটা বিশেষ বাদ আছে বলে আমার কবিতায় এ সমন্বয় হয় না কেন? এই খেইটা খুঁজছি।

: এদিকে শরীর তো গেল।

: যাক্। এখন ঢিল দিতে পারব না। আমি সব জেনে ফেলতে চাই না, রাতারাতি কবি হতে চাই না, কোথায় ঠেকছি শুধু ইঙ্গিতটুকু চাই। খেইটা ধরতে পারলেই আমি শান্ত হয়ে যাব। কিন্তু তোমার কি হয়েছে? তুমি শুকিয়ে যাচ্ছ কেন?

: আমি?— আমিও খেই খুঁজছি।

মানসী ম্লান মুখে হাসে।

তৃপ্তি বলে, আস না যে?

: আমার যে কিভাবে দিনরাত কাটছে—

: সে তো জানি। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। এর কি শেষ নেই ?

: যা খুঁজছি পেলেই শেষ। কিন্তু তোমার কি হয়েছে ? চোখের কোণে কালি পড়েছে যে ?

: খুব বেশী শান্তিতে আছি কিনা, তাই।

: বাড়ীর লোকের রাগ কমে নি ?

: এখনো হাল ছাড়ে নি, রাগ কমবে! সে যাক্। আমি রোজ তোমার খবর নেব, এটা কি উচিত ? আমার কত অসুবিধা বোঝ না ?

: খবর নেবার দরকার কি ?

: দরকার তুমি বুঝবে না। তুমি কি কাণ্ড করছ তুমি নিজেই জান না। রোজ ভাবি আজ খবর আসবে নববাবু রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন, নয় টি. বি. হাসপাতালে গেছেন। দিনে একবার উঁকি মেরে গেলে দোষ কি ? একটু তবু নিশ্চিন্ত থাকতে পারি আজকের দিনটাও ভালয় ভালয় কেটেছে।

সবই বুঝি। বাড়াবাড়ি হচ্ছে তাও টের পাই। কিন্তু ভিতরে আমার এমন অস্থিরতা, এত ব্যকুলতা যে, এই প্রাণপাত অনুসন্ধানের তীব্রতা কমাতে পারি না। আশা নিয়ে ছুটে যাই সবরকম মানুষের কাছে, মিলেমিশে আপন

হবার চেষ্টা করি মানুষের— আত্মীয়তা যদি সন্ধান দেয় কিসের অভাবে আমি ব্যর্থ হয়ে গেলাম। আশা নিয়ে রাত জেগে আত্মীয়তা করি দেশ বিদেশের সকল রকম পুরানো কবি নতুন কবির সঙ্গে— তাদের সৃষ্টি থেকে যদি খোঁজ পাই আমি কেন স্রষ্টা হতে অক্ষম।

জীবনের কতদিকের কত নতুন পরিচয় পাই, কত ভুল ভেঙ্গে যায়, কত দুর্বলতা ধরা পড়ে নিজের। কিন্তু আসল যে জিনিষটি আমার দরকার সেটির খোঁজ মেলে না।

আলেয়া বলে, আমি কিছুই বুঝি না এসব— কিন্তু আমার মনে হয় কি জানেন? আপনি মিছে ব্যস্ত হচ্ছেন। আপনা থেকেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

: আগে ব্যস্ত হই নি। কিন্তু এখন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, ব্যস্ত না হয়ে উপায় নেই। এতটা এগিয়েছি বলেই বাকীটুকু তাড়াতাড়ি না এগোলে চলছে না।

: কি জানি, বুঝি না। শুনি যে সাধকদের এরকম অবস্থা হয়— সিদ্ধিলাভের ঠিক আগে।

: এতো সে সাধনা নয়।

: কেন? লক্ষ্য ভিন্ন হোক, সাধনার রকম আলাদা হোক, কিন্তু সব সাধনাই সাধনা। যা চাই তা পাওয়ার চেষ্টাই সাধনা— পাওয়াটা সিদ্ধি।

আলেয়ার বড় কথা সহজ ভাবে ভাবার এই নমুনা আমাকে সত্যই আশ্চর্য করে দেয়।

একদিন অধীর আসে। মুখখানা বিবর্ণ আর আশ্চর্যরকম প্রশান্ত।

: ফাঁদে পড়েছি।

: কি ফাঁদ ?

: টি. বি।

যতক্ষণ সে বসে থাকে মনে হয় আমার দেহমনের অস্থিরতা যেন শান্ত হয়ে গেছে। একটি দুরন্ত ছেলে প্রচণ্ড প্রহার পেলে আরেকটি দুরন্ত ছেলের যেমন হয়! কথা বলতে বলতে সারাক্ষণ আমি তার মুখের দিকে চেয়ে থাকি। ভাবি, একি অনিবার্য ছিল ? একি প্রয়োজন ছিল ?

অধীর চলে যাবার পর একটা অদ্ভুত একাকীত্বের বোধ জাগে, একটা খাপছাড়া কষ্টে যেন দম আটকে আসে। বসে থাকা অসম্ভব মনে হয়, বাইরে মানুষের মধ্যে যেতে ইচ্ছা করে না। ঘরটা ছোট, বাইরে বারান্দায় গিয়ে দুপুরবেলা পায়চারি করি আর আকাশপাতাল ভাবি।

একসময় খেয়াল হয়, ঘেমে গেছি। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

নীচে নেমে শুনতে পাই এ ঘরে মাকে বৌদি বলছে, দুপুরবেলা ঠিক পাগলের মত ছটফট করছে বারান্দায়। এ আমি আগেই ভেবেছিলাম। এ হলো ভেতরের ব্যারাম, বাড়তে দিলে ঠেকানো যায় না। আপনারা শুধু প্রশ্রয় দিয়ে গেলেন। আমি কত চেষ্টা করেছি—

মা আঁচলে চোখ মোছেন।

: বৌমা, করুক যা খুশী। তুমি বরং ওকে নিজের মনে থাকতে দাও, শুধরোবার চেষ্টা কোরো না। তাতে ফল আরও খারাপ হয়।

বৌদির মুখ লাল হয়ে যায়।

: ওঃ, দোষটা হলো আমার ?

: দোষের কথা নয়। তুমি তো কিছু করতে পারবে না। এ রোগ যিনি দিয়েছেন, তিনিই ব্যবস্থা করবেন। কে জানে এই অভাগীর পেটে হয় তো সত্যি কোন মহাপুরুষ জন্মেছে, আমরা না বুঝে ওকে কষ্টই দিচ্ছি।

বৌদি ফুঁসে ওঠে, বুঝেছি মা, বুঝেছি। আমি ভালো করতে চাইলে মন্দ তো হবেই। আপনারা নয় মহাপুরুষকে নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকুন।

মা কেঁদে আমায় উদ্দেশ করে বলেন, চোরের মতো আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিস, তোর লজ্জা করে না নব ?

এগিয়ে সামনে গিয়ে বলি, লজ্জা কিসের ? মনের কথা বৌদি তো আগে জানায় নি, আজ এই প্রথম

বলল। তাড়িয়ে দেবার পরেও এখন যদি আমরা থাকি, তা হলে লজ্জার কথা হবে। কাঁদছ কেন? আজকেই আমরা চলে যাব।

বৌদি ভড়কে গিয়ে বলে, কি বলছ যা তা? তাড়িয়ে দিলাম কখন? একি আমার বাড়ী যে চলে যেত বলব?

: তোমার বাড়ী বৈকি। তোমার নামেই বাড়ী। তাড়িয়ে তুমি সত্যি দিয়েছ। কথাটা ফিরিয়ে নিতে পার, কিন্তু আমাদের ফেরাতে পারবে না।

মাকে তৈরী হতে বলে জল খেয়ে ঘরের খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। তৃপ্তিদের বাড়ীর বৈঠকখানাটা চেনা লোককে ভাড়া দেবার কথা আছে— তৃপ্তির বিয়ের হাঙ্গামা চুকবার পর। বিয়েটা তৃপ্তি বাতিল করতে পেরে থাক বা না থাক, বিয়ের তারিখের আগেই অন্য কোথাও উঠে যাব বলে সাময়িক ভাবে ঘরটা ভাড়া নিতে পারব। জোর করে ধরলে আমাকে ওরা না বলতে পারবে না।

মাকে নিয়ে আগে এখানে উঠি। তারপর স্থায়ী ব্যবস্থা হবে।

কড়া নাড়বার আগেই তৃপ্তি বাইরের দরজা খুলে দেয়। হেসে বলে, তোমার জন্যই রাস্তায় চোখ পেতে ছিলাম ভেবো না কিন্তু।

: *তবে কার জন্য?*

: নিজের জন্য। রাস্তায় মানুষ দেখতে ভালো লাগে।

দরজা বন্ধ করেই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, তুপুর বেলা হঠাৎ? যা খুঁজছিলে পেয়েছো?

: না। ঘর খুঁজতে বেরিয়েছি।

: ঘর খুঁজতে?

সব শুনে চোখ বড় বড় করে তৃপ্তি বলে, একটা কথার কথায় এমন রেগে গেলে? সঙ্গে সঙ্গে ঘর খুঁজতে বেরিয়ে পড়লে? নাঃ, যা ভেবেছিলাম তা সত্যি নয় দেখছি। অন্ততঃ একজনকে তুমি সত্যি ভালবাসো।

: তার মানে?

: যার জন্য একটু দরদ আছে। এজগতে কারো জন্য তো একফোঁটা দরদ নেই— এ তবু মন্দের ভালো!

তৃপ্তি জ্বালাভরা হাসি হাসে।

আবার বলে, কিম্বা এও তোমার কর্তব্যবোধ? যন্ত্রের মতো কর্তব্য করে যাচ্ছ?

ঝন্ ঝন্ করে কথাগুলি কানে বাজে, অনেকের কাছে শোনা মৌলিক ধ্বনির মৌলিক প্রতিধ্বনির মত। শুধু এভাবে কেউ বলে নি বলে এরকম স্পষ্ট হয় নি কথাটার মানে। এই সেদিন লক্ষ্মী আমায় নিষ্ঠুর বলেছিল— পড়াতে যাই, পড়িয়ে চলে আসি। কবিতা শুনে তমালের শুধু তুর্বোধ্য ঠেকে নি, শুকনো খটখটে ঠেকেছিল কবিতাটা।

আমি স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকি। এতক্ষণে

নজরে পড়ে যে তৃপ্তির পরণের কাপড়খানা ময়লা ও মোটা, গায়ে তার গয়নার চিহ্ন নেই। মাথার চুলে তেলের অভাবটা সুস্পষ্ট।

: এই নাকি ধারণা তোমার আমার সম্বন্ধে ?

: আর কি ধারণা করব ? সেদিন অনেক লেকচার দিলে, লেকচার দিয়ে তো আমাদের ভোলাতে পারবে না। আমরা সাদাসিদে সাধারণ মেয়ে। ভালবাসাটা তোমার আসেই না— ভালবাসার ক্ষমতাই আসলে তোমার নেই। না ভালবাসো মানুষকে, না দেশকে, না তোমার কবিতাকে। কোন কিছুকে নয়। পারলে তো ভালবাসবে ? তুমি হলে একটা সূক্ষ্ম যন্ত্র।

তৃপ্তি আবার সেই জ্বালাভরা হাসি হাসে।

: যাকগে, ঘরটা যদি চাও, বাবাকে আর দাদাকে তোমায় নিজের বলতে হবে। আমি কিছু বলতে পারব না। আমার মুখ নেই। আসলে, আমি আর বাড়ীর মেয়ে নই এখন, দাসী।

: তাই দেখছি।

: দেখছো ? চোখে পড়েছে আমার বেশটা ? বাড়ীর লোকের কথা শুনতে রাজী হলে মেয়ে হতে পারি— নইলে দাসী হয়ে থাকতে হবে।

স্থির চোখে তার দিকে চেয়ে থাকি।

: আমি যন্ত্রের মত মানুষ বলে ? ভালবাসতে জানি না বলে ?

তৃপ্তি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

: আচ্ছা আমি যাই।

: ঘরের কথা বলতে আসবে নাকি ?

: ভেবে দেখি। সব কথা একটু ভেবে দেখতে হবে !

ভালবাসি না ? ভালবাসতে জানি না ? তৃপ্তিকে বা মানসীকে ভালবাসার কথা নয়— মানুষকে ভালবাসি না, ভালবাসতে জানি না ? কবিতাকে পর্যন্ত নয় ? আমার যে ভালবাসা সেটা যান্ত্রিক ?

তৃপ্তির কাছে শেষে হারানো খেই পেলাম— যার সন্ধানে পাগল হয়ে উঠেছি ! ভালবাসা ছাড়া শ্রদ্ধা নেই— শ্রদ্ধা ভালবাসা ছাড়া আত্মীয়তা হয় না। শ্রদ্ধায় ভালবাসায় মানুষের আপন না হয়ে কি করে জানব সেই প্রাণের ভাষা— যে ভাষায় ছাড়া জীবন কবিতায় কথা কয় না।